তাসাওউফ সম্রাট হযরত ইমাম

আলী ইবনে হোসাইন জয়নুল আবেদীন (রাদ্বি)

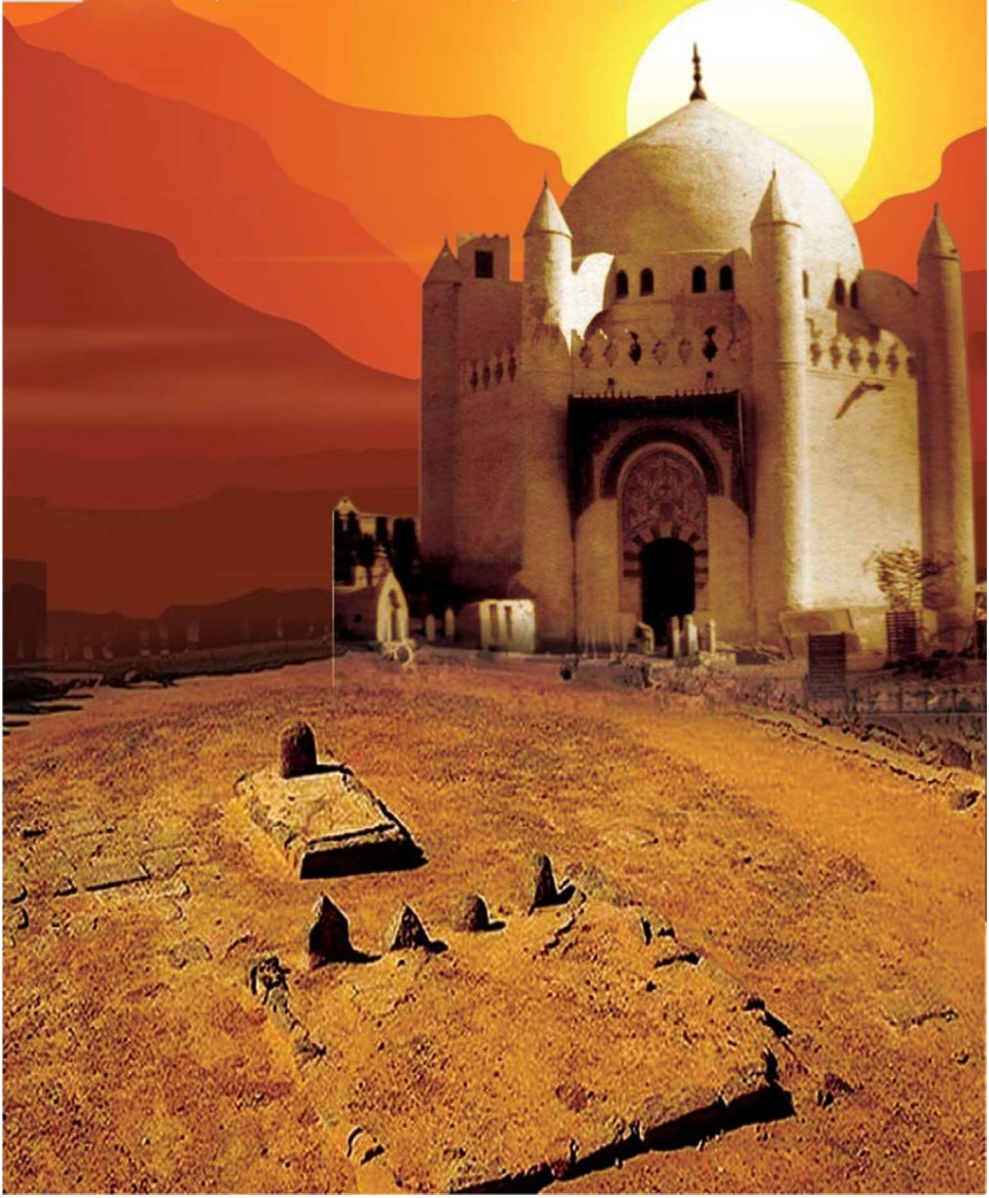

তাসাওউফ সম্রাট হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশন আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ:
৩১ আষাঢ় ১৪৩১ বাংলা, ১৫ জুলাই ২০২৪ খ্রি.
প্রচ্ছদ:
কনসেপশন কমিউনিকেশন

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্য:
৩০০ টাকা মাত্র।

ISBN: 978-984-8083-39-0

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পেশ কালাম

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে তাসাওউফ সম্রাট, আহলে রাসুল হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র জীবনী প্রকাশিত হলো। বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার আলোকে মুসলিম উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে নৈতিক বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণের পর আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তাসাওউফ সাধনার নিমিত্তে স্বতন্ত্র জ্ঞানীয় ক্ষেত্র চালুর অপরিহার্যতা আহলে বাইতে রাসুল হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেন। কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইতে রাসুল (দ.) হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র নির্মম পন্থায় শাহাদাত বরণের করুণ ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) শুধু শোক–অনুতাপে দগ্ধ হননি বরং মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্দার গোত্রের একশ্রেণির ব্যক্তিবর্গের কপটতা, ভণ্ডামি, মানসিক দুর্বলতা এবং সত্যের পক্ষে প্রত্যয়ের অভাব লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। কারণ এ ধরনের দুর্বল মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের মাধ্যমে সৎ সাহসী এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী ন্যায়পন্থী উম্মাহ্ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা, "তবে (যুদ্ধের সময়) বিশ্বাসীদের সকলের এক সাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি অংশ অবশ্যই যুদ্ধযাত্রায় বিরত থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। এ জ্ঞানীরাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যোদ্ধাদের নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতন করে তুলবে। ফলে তারা অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে" –(সূরা তওবা : ১২২) অনুযায়ী তিনি প্রধানত মানবজাতিকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দানকে নিজের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। জীবনী গ্রন্থে তাঁর এই কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র পিতৃ বংশ ধারা যেমন বিশ্ব শ্রেষ্ঠ, তেমনি মাতৃবংশ লতিকাও পারস্য সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। এর পরেও তাঁর সংযত জীবনাচার ছিল অতি সাধারণ অভেদ মানব সত্তার প্রতীক। তিনি ছিলেন নির্ভীক, কষ্ট সহিষ্ণু, আবেগমুক্ত, সংযম স্বভাবের পথিকৃৎ। কার্যত তাঁর কর্মতৎপরতায় মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্মুখে তাসাওউফ পন্থার প্রকাশ ঘটেছে। পুস্তকটিতে তা উপস্থাপিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। আশা করি পুস্তকটি অধ্যয়ন করে পাঠক উপকৃত হবেন।

আমি আল্লাহ্‌র দরবারে পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি। সুম্মা আমিন! আস্‌ সালাম।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
সাজ্জাদানশীন
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
ও
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উৎসর্গ

“তাঁদের প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন তা থেকেই তাঁরা অভাবী, এতিম ও বন্দিকে খাবার দান করেন। (মনে মনে বলেন) কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাই না, এমন কি কৃতজ্ঞতাও নয়”– (সূরা দাহর : ৮-৯)।

পবিত্র কোরআনের উপর্যুক্ত বাণী
যাঁর স্বভাব এবং কর্ম ভূষণ,
বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)’র প্রিয়তম কন্যা
খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ জোহরা (রা.)’র
পবিত্র করকমলে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের বিনীত আরজ

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ পাকের দরবারে অশেষ শুকরিয়া, অসংখ্য দরুদ সালাম ও তসলিম বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর প্রতি। অবশেষে আল্লাহ্র অশেষ কৃপায়, নবিজী (দ.) বংশের পবিত্রতম আওলাদ হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ পেল। এ পুস্তক রচনা কল্পে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছি এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টি এবং মাইজভাণ্ডারী একাডেমির মাননীয় সভাপতি রাহ্বারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.)'র নিকট থেকে। মাইজভাণ্ডারী একাডেমি পরিচালনা পর্ষদ সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করায় আমি তাঁর প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই পুস্তক লিখার জন্যে সর্বপ্রথম আমাকে উৎসাহিত করেছেন সতীর্থ এবং ঘনিষ্ঠ সজ্জন জনাব মোহাম্মদ এয়াসিন আলী। তিনি আমার হিতার্থী এবং সতীর্থ মরহুম আবদুল্লাহ্ ফারুক চৌধুরীর পুস্তক সংগ্রহশালা থেকে ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক এবং খ্যাতিমান অনুবাদক মদিনা পাবলিকেশান্স এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রচিত "ইমাম যয়নুল আবেদীন" পুস্তকটি হস্তান্তর করে আমাকে প্রেরণাদীপ্ত করেছেন। এ জন্যে আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তক রচনার জন্যে নির্ভরশীল তথ্য-উপাত্ত পেয়ে যাঁদেরকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হয় তাঁরা হলেন সর্বজনাব মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পণ্ডিত এবং সুলেখক মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, নাসির হেলাল, নবি (দ.) এর আশেক-মজনুন হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহ.), হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী হাজবিরী (রহ.) তথা দাতা গঞ্জে বখ্শ এর গ্রন্থ অনুবাদক মুহাম্মদ সিরাজুল হক, কাযী যাইনুল আবেদীন মিরাঠী

লিখিত তারীখে মিল্লাত তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা নোমান আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ তথ্য পঞ্জীতে উল্লেখিত সকল পূণ্যবান লেখক-গবেষক এবং গবেষণা সংস্থাকে।

বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পুস্তক ইমাম যয়নুল আবেদীন হাতে আসায় এই পুস্তককে কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করে বেশি সংখ্যক উদ্ধৃতি হুবহু চয়ন করা হয়েছে। কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত পুস্তক থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যে লেখকদ্বয়ের প্রতি সালাম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল।

বাংলা ভাষায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য একমাত্র পুস্তক হচ্ছে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান রচিত ইমাম যয়নুল আবেদীন। অথচ এ ধরনের ত্যাগী, নিভৃতচারী মহান তাসাওউফ সাধকের জীবন সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে অসংখ্য বাংলা ভাষাভাষী পাঠক বিশেষ করে নবি (দ.) প্রেমিক জনগণের ঔৎসুক্যের শেষ নেই। মূলতঃ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের বিশেষ বর্ণনা প্রদান সাপেক্ষে এই মহান সাধকের ভূমিকা এবং চিন্তাধারা বর্ণিত হয়েছে।

পুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুস্তক রচনায় প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, এ ওয়াই এম জাফর, মরহুম এ এন এম এ মোমিন, ড. জসীম উদ্দিন, তানভীর হোসাইন, রিয়াজ উদ্দীন, রোকনুজ্জামান টুটুল, মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ্, আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন, লিপিকার বাবু সঞ্জয় পাল এবং জনাব শাখাইরুল ইসলামের উৎসাহ এবং সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়। বইটির চূড়ান্ত সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশিষ্ট লেখক/অনুবাদক জনাব মুহাম্মদ ওহীদুল আলম এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটি প্রকাশ করায় মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। বইয়ের বিষয়ে মন্তব্য প্রদানের দায়িত্ব সহৃদয় পাঠকের। আশাকরি এ পুস্তকের মাধ্যমে যদি সামান্যভাবেও দ্বীনের খেদমতের আঞ্জাম হয় তাতেই আমাদের সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

– জহুর উল আলম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় :	পারিবারিক ঐতিহ্য পরিচিতি	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	জন্ম ও বাল্যকাল	২০
তৃতীয় অধ্যায় :	শিক্ষা-দীক্ষা	২৩
চতুর্থ অধ্যায় :	মাতৃভক্তি এবং বিভিন্ন আচরণ প্রসঙ্গ২৭	
পঞ্চম অধ্যায় :	প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ এবং সংকটের মুখে ইমাম পরিবার	২৯
ষষ্ঠ অধ্যায় :	হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর উপর বেলায়ত হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ	৪০
সপ্তম অধ্যায় :	অসীম সাহসী এবং প্রতিবাদী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)	৪৪
অষ্টম অধ্যায় :	মদিনার পথে পবিত্র রওজা আকদসে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)	৫৩
নবম অধ্যায় :	ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর বিবাহ এবং পবিত্র জীবন ধারা	৬০
দশম অধ্যায় :	মদিনা বিক্ষোভ বিষয়ে ইয়াযিদের প্রলয়ঙ্করী সিদ্ধান্ত এবং হারারায় গণহত্যা	৬৬
একাদশ অধ্যায় :	ইয়াজিদ বাহিনীর মক্কা নগরী অবরোধ এবং কাবা শরিফে অগ্নি সংযোগ	৭১
দ্বাদশ অধ্যায় :	কুফায় বিদ্রোহ এবং মুখতার ছাকাফীর উত্থান	৭৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের নির্দেশে কুফা আক্রমণ ও মুখতারের পতন	৮১
চতুর্দশ অধ্যায় :	উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের কুফা জয় এবং মক্কা অভিযান	৮৩

পঞ্চদশ অধ্যায় :	আরব ভূখন্ডে রক্তক্ষয়ী পালা বদলে কেন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নীরব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন	৯৩
ষষ্ঠদশ অধ্যায় :	ইমাম যয়নুল আবেদীন কী সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না?	৯৯
সপ্তদশ অধ্যায় :	ভাগ্য বিপর্যয়কালে মদিনাবাসীদের আশ্রয় কেন্দ্র ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র আস্তানা	১০২
অষ্টাদশ অধ্যায় :	ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে কারবালা হত্যাযজ্ঞের বিভৎস নায়ক ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির	১০৪
ঊনবিংশ অধ্যায় :	হক্কুল ইবাদ তথা মানব সেবায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)	১০৭
বিংশ অধ্যায় :	দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)	১১১
একবিংশ অধ্যায় :	হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)'র জীবনে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রভাব	১২০
দ্বাবিংশ অধ্যায় :	ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিক প্রসঙ্গ	১২৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় :	বাদশাহ্ আবদুল মালিকের দরবারে বন্দী ইমাম (রা.)	১২৯
চতুর্বিংশ অধ্যায় :	ইবাদত প্রক্রিয়া এবং যয়নুল আবেদীন উপাধি ও অলৌকিক অধ্যায়	১৪০
পঞ্চবিংশ অধ্যায় :	উমাইয়া বন্দীশালায় অলৌকিক ঘটনা এবং কারামত	১৪৬
ষট্‌বিংশ অধ্যায় :	অন্তিম সময়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)	১৫৩
সপ্তবিংশ অধ্যায় :	বেলায়তের উত্তরাধিকার এবং ইমামত	১৫৫
অষ্টাবিংশ অধ্যায় :	পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) (বাকের রা.) এর প্রতি উপদেশ	১৫৭
ঊনত্রিংশ অধ্যায় :	ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর সম্পর্ক	১৫৯

প্রথম অধ্যায়

পারিবারিক ঐতিহ্য পরিচিতি

আহলে বাইত এবং পাকপাঞ্জাতনের পবিত্রতায় যাঁরা 'সিরাজুম মুনিরা' হয়ে এখনো আল্লাহ্‌র জমিনে তাওহীদের সূর্য দীপ্তমান রেখেছেন তাঁদের অনন্য একজন হলেন হযরত আলী আসগর (রা.)। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরম নৈকট্য অর্জনে ধন্য হওয়ায়, সাধনা, রিয়াযত, ইবাদত, ধৈর্য ও দানশীলতার পরশে তাপসকুল শিরোমনি হিসেবে সর্বত্র তিনি পরিচিত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নামে। যার অর্থ হচ্ছে 'সাধক কুলের ভূষণ'। কারবালার রক্তাক্ত প্রান্তরের বীভৎস ঘটনাপঞ্জী এবং রক্তলোলুপ হিংস্র হায়েনার বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুরুষ সদস্য, যিনি অসুস্থতার কারণে বেঈমান, মুনাফিক, জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে রণাঙ্গনে অসি চালনা করতে অনুমতি পাননি। বয়সে তিনি তখন কিশোর-বালক। এর পরেও মহান-মহৎ পিতা, ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধারার জিন্দাকারী, সত্য ও ন্যায়ের আপোষহীন সৈনিক, অমিতেজ বীর, সৈয়্যদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিকট কাতরকণ্ঠে পরম সাহসিকতায় জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিশোর পুত্রের শারীরিক অবস্থা এবং রোগশয্যা দেখে তিনি তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাতের পর নরপিশাচ ইবনে যিয়াদের বাহিনী ইমাম শিবিরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তখন ফুফু হযরত যয়নাব (রা.) নরহন্তার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন।

পবিত্র বেলাদত (জন্ম)

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর জন্ম হিজরী ৩৩ সনে, কারো কারো মতানুযায়ী ৩৬ সনে। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর জন্ম হিজরী ৩৮ সন হিসেবে উল্লেখ আছে। তাঁর ডাক নাম আবু মুহাম্মদ, আবুল হাসান, আবু বকর। যয়নুল আবেদীন এবং সাজ্জাদ তাঁর উপাধি। মায়ের ইচ্ছানুযায়ী পিতৃপ্রদত্ত নাম আলী আসগর। তখন খোলাফায়ে রাশেদার দায়িত্বে ছিলেন হযরত আলী (রা.)।

পিতৃ পরিচয়

ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) পিতা হলেন শেরে খোদা, সেরতাজে বেলায়ত, জিল্লে নবুয়ত হযরত আলী (রা.) এর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়্যদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। তাঁর মহান পিতা সম্পর্কে সুলতানুল হিন্দ, খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত সৈয়দ মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (ক.) স্বীয় দিওয়ানে উল্লেখ করেছেন,

"শাহ আস্‌ত্‌ হোসাইন প'দ শা'হ্‌ আস্‌ত্‌ হোসাইন
দীন আস্‌ত্‌ হোসাইন ও দীনে পান'হ আস্‌ত্‌ হোসাইন
সার দ'দ্‌ না দ'দ দাস্‌ত্‌ দার্‌ দাস্‌তে ইয়াজিদ
হক্কক্ক'কে বান'য়ে লা এলাহ্‌ আস্‌ত্‌ হোসাইন।"

অর্থাৎ হোসাইন রাজা হোসাইন বাদশাহ্‌/ হোসাইন দীন হোসাইন আশ্রয়/ শির দিয়েছে দেয়নি তো হাত ইয়াজিদের হাতে/ প্রকৃত পক্ষেই হোসাইন লা-ইলাহার বুনিয়াদ।

সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত হোসাইন (রা.) সম্পর্কে আরো উল্লেখ করেন,

"ক'রী কে হোসাইন এখতিই অরী কার্‌দী
দার গুলশানে মোসতাফ' বাহ'রী কার্‌দী
আয্‌ হীচ্‌ পাইয়াম্‌বার' ন্‌ না ইঅ'বাদ ইন্‌ ক'র্‌
ভাল্লাহ্‌ এই হোসাইন্‌ ক'রী কার্‌দী।"

অর্থাৎ হে হোসাইন, যে কাজ তুমি আঞ্জাম দিয়েছো, তা দিয়ে মোস্তাফার ফুল বাগিচায় বসন্ত এনে দিয়েছো, কোন পয়গম্বর যে কাজ করার সুযোগ পায়নি, খোদার কসম, হে হোসাইন, তুমি সে কাজ সম্পন্ন করেছো। তাওহীদের সূর্য নবতর উজ্জলতায় যাঁর অসীম সাহসিকতা এবং তোজোদীপ্ততায় বিকিরণ ছড়িয়েছে তিনি হলেন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। তাঁরই সুযোগ্য পঞ্চম পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)।

ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) এর দাদা হলেন রাসুলে খোদা (দ.) এর জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার ইমামুল আউলিয়া হযরত আলী মর্তুজা (রা.)। দাদী হলেন বিশ্বনবি (দ.) এর প্রিয়তম কন্যা, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (রা.)। হযরত ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে বিশ্বনবি (দ.) বর্ণিত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, "কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবো। অতঃপর ঘোষিত হবে, হে পুনরুত্থিত আদম সন্তানগণ! তোমরা চোখ বন্ধ কর, নবি নন্দিনী ফাতিমা (রা.) পুলসিরাত পার হবেন। যখন তিনি ঐ সেতু পার হতে থাকবেন, তখন তাঁর শরীর সবুজ রংয়ের দু'খানা চাদরে ঢাকা থাকবে।" হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, "বিশ্বনবি (দ.)'র পরেই হযরত ফাতিমা (রা.) সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন।" হযরত ফাতিমা (রা.) হলেন সেই সুমহান ব্যক্তিত্ব যাঁর পুণ্য কর্মশীলতার পরিচিতি, "তাদের প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন তা থেকেই তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিকে খাবার দান করে। (সংগোপনে ব্যক্ত করে) 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে এর কোন প্রতিদান চাই না, এমনকি কৃতজ্ঞতাও নয়"– (সূরা দাহর : ৮-৯)। এ ধরনের মহান গুণান্বিতা বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্রতম শোণিতের একমাত্র উত্তরাধিকারিনীর মহান উত্তরাধিকার হলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)।

মাতৃ পরিচয়

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) মাতার নাম শহর বানু। তিনি ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ সম্রাট ইয়াজদগেরদ এর তৃতীয় কন্যা। হযরত উমর ফারুকের (রা.) খিলাফত পরিচালনা কালে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র আগাম বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী বুকে পবিত্র কোরআনের আলোক-মশাল ধারণ করে তাওহীদি নিশান হাতে বীর মুজাহিদগণ যখন মজলুম মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিঃশঙ্ক চিত্তে এগুতে থাকেন তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নির্যাতিত গণমানুষের পরিত্রাতা হিসেবে মুসলিম অভিযাত্রীরা পরম সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পৃথিবীতে তখন রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সামন্ত রাষ্ট্রশক্তি। কিন্তু তাওহীদের উর্মি-উত্তাল উদ্দামতা এবং সততা, সমতা, নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার মহাপ্লাবনের প্রচণ্ডতায় এই সকল রাষ্ট্র শক্তি খড় কুটো-আবর্জনার মতো ভেসে যেতে থাকে।

খিলাফত পরিচালনা কালে হযরত উমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববিতে চাটাইয়ের উপর বসে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তা বাস্তবায়ন করতেন। অতি সাধারণ বস্ত্র-বসনধারী খলিফা

উমরকে (রা.) চেনার কোন উপায় ছিল না। অথচ দেশ-বিদেশের সর্বত্র তাঁর প্রভাব-সম্মান ছিল কল্পনাতীত। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সমীহ করতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর সম্মুখে যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার এমনকি ভিন্ন মত পোষণের সাহস রাখতেন। অতি সাধারণ বেশভূষাধারী মহান খলিফা উমর (রা.) শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, মামুলী অস্ত্র এবং শুক্নো খেজুরের রসদ-সামগ্রী নিয়ে শুধুমাত্র ঈমানের বলে তেজোদ্দীপ্ত পরম সাহসী মুজাহিদ বাহিনী দিয়ে রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্য রাজের হাজার-হাজার বছরের সৌখিনতা, দাম্ভিকতা, অহমিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মজলুম মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাওহীদের পয়গাম ছড়িয়ে দেন। মদমত্ত শোষক, নিপীড়ক জালিম শাসকরা তালিযুক্ত বস্ত্রধারী খলিফা উমর (রা.) প্রেরিত তাওহীদি সৈনিকদের নিকট আত্মসমর্পণ এবং পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে সাম্রাজ্য ত্যাগে বাধ্য হন।

ইসলাম ধর্মের বিজয় পতাকা যখন সর্বত্র উড্ডীন হতে চলেছে সে সময় পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন ইয়াজদগেরদ। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্রাট ইয়াজদগেরদ রাজধানী মাদায়েন থেকে বিতাড়িত হন। এক পর্যায়ে পারস্য সম্রাট কাবুলের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। এসময় খলিফা হযরত উমর (রা.) সেনাপতি হযরত আহনাফকে (রা.) পত্র মারফত জানান যে, "যদি পারস্য সম্রাট বাড়াবাড়ি না করেন, তবে তাকে আর তাড়া করবেন না। বিজিত এলাকার জনগণের কল্যাণ সাধনে মনোযোগ দেবেন।" খলিফা এটিও অবহিত করেন যে, "সাম্রাজ্য বিস্তার আমাদের অভিপ্রায় নয়। বরং যারা তাওহীদ প্রচারে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করবে তাদের প্রতিরোধ করাটা আমাদের অঙ্গীকার।"

সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে খলিফা এবং খিলাফতের দৃষ্টিভঙ্গী যতোই সংযত, উদার এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মূলক সরলরৈখিক হোক না কেন, প্রতিপক্ষের দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য এবং নির্বিকার মনোভাব ছিল ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ পরায়ণ। ফলে পরাজিত হয়ে, সাম্রাজ্য হারিয়ে, রাজকীয় ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে পরদেশে আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও পারস্য সম্রাট ইয়াজদগেরদ বিপুল অর্থ সম্পদ ব্যয় করে 'আর্য অহমিকা' ধারণ করে ছিন্ন-ভিন্ন সেনা বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। এ ব্যাপারে সামরিক সাহায্য এবং সেনা রসদের জন্য কাবুলের পার্শ্ববর্তী চীন সম্রাট খাকানের দরবারে উপস্থিত হন।

তাওহীদের মর্মচেতনায় প্রেরণাদীপ্ত, একমাত্র মহান রব আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম আনুগত্যের সুবাদে পরম সাহসী মুজাহিদরা মরু সাইমুমের ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে সর্বত্র বিজয় ঝাণ্ডা উত্তোলন করতে থাকে। কোথাও তাঁদের পরাজয় নেই। বিশ্বের বড় বড় সাম্রাজ্যের অধিশ্বররা মদিনার দীপ্ত অঙ্গীকার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে উৎকণ্ঠিত

এবং ভীত বিহ্বল হয়ে উঠে। পরাক্রমশালী রোমান-পারস্য সম্রাটদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে চীন সম্রাট খাকানও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ফলে পারস্য সম্রাট ইয়াজদগেরদকে সাহায্য করার বিষয়ে সম্রাট খাকানও ঐকমত্যে পৌঁছেন। পারস্য সীমান্তে চীন সাম্রাজ্যের অবস্থান। চীন সম্রাট ধারণা করেন যে, তাওহীদি বাহিনীর আক্রমণের পূর্বে যদি পারস্য সীমান্তে চীন-পারস্য বাহিনী আক্রমণ ও অভিযান শুরু করে তা হলে মরু সাহারার সাইমুমের অপ্রতিহত অগ্রাভিযান প্রতিহত করে পারস্য সম্রাটকে পুনরায় স্বদেশে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। এটি ছিল চীন সম্রাটের অগ্রাভিযান। চীন সম্রাটের চতুরতা এবং পারস্য সম্রাটেরা অহমিকা মুজাহিদ সেনাপতি হযরত আহনাফ (রা.) এর নেতৃত্বাধীন আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত মুজাহিদ বাহিনীর প্রতিরোধে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সম্রাট খাকান তাঁর অভিলাষ পরিত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। অন্যদিকে পরাজিত পারস্য সম্রাট ইয়াজদগেরদ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

সম্রাট ইয়াজদগেরদ নিহত হবার পর পরিবার-পরিজন, বিরাট সেনাবাহিনী এবং পারস্য সম্রাটদের তিন হাজার বছরে সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার মদিনায় খলিফার দরবারে হাজির করা হয়। বন্দীদের সঙ্গে সম্রাটের তিন কন্যাও ছিলেন। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা বন্দী দাস-দাসী হিসেবে বাকী জীবন অতিবাহিত করার নিয়মই বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু খলিফা হযরত উমর সম্রাটের তিন কন্যা এবং তাঁর পরিবার-পরিজন বিষয়ে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত নন। মজলিসে শুরার বৈঠক ডেকে রাজ পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন খলিফা। সমকালীন প্রচলিত নিয়ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রাজ কন্যারা বাকী জীবন ক্রীতদাসী রূপে কাটাতে হবে ভেবে শংকিত ও শিউরে উঠেন। তাদের আরো শংকা হয় যে, খলিফা মহানুভব হয়ে যদি তাদের মুক্তিও দেন তবুও তাদের সম্মানজনক জীবন যাপনের কোন প্রকার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে না।

সম্রাট কন্যাদের এ ধরনের হত বিহ্বল মানসিক অবস্থার মধ্যে মজলিসে শুরার বৈঠকে কন্যাদের উপস্থিতিতে তাদের ভবিষ্যত বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। অনেক আলোচনার পরেও যখন কোন সমাধান আসেনি তখন খলিফা এ বিষয়ে ফয়সালার ভার হযরত আলী (রা.) এর উপর ছেড়ে দেন। জ্ঞানের দ্বার হযরত আলী (রা.) বিষয়টির সম্মান জনক ফয়সালার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উল্লেখ করেন যে, “এরা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খান্দানের মেয়ে। ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে তারা এখন আমাদের আশ্রিতা। ন্যায়ের খাতিরেই আমরা এ ধরনের আশ্রিতার সঙ্গে সাধারণ বন্দীদের মতো আচরণ করতে পারি না। এদের জন্য একটা মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হোক। আমি নিজে এদের মুক্তিদানের অর্থ বায়তুল-মালে জমা করে দেব। এরপর এদেরকে ইসলাম ধর্ম

কবুল করিয়ে মদিনার শরিফ ঘরের যে কোন তিনজন যুবককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার অথবা অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করার এখতিয়ার দেয়া হোক।”

উপস্থিত সকলে হযরত আলীর প্রস্তাব সমস্বরে মেনে নেন। বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে সম্রাট কন্যারাও হযরত আলীর (রা.) প্রস্তাব শুনেন। পিতৃহারা কন্যাগণ শেরে খোদা হযরত আলীকে (রা.) পিতার স্থলে দেখতে পেলেন। সম্রাট কন্যারা এধরনের প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্ময়ের ঘোর কেটে উঠলে তারা সেখানেই হযরত আলী (রা.)'র হাতেই ইসলাম ধর্ম কবুল করেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় প্রথম কন্যা খলিফা হযরত উমরের (রা.) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে (রা.), দ্বিতীয় কন্যা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে (রা.) এবং কনিষ্ঠা কন্যা শহর বানু হযরত আলীর (রা.) পাশে উপবিষ্ট জান্নাতে যুবকদের সর্দার হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে স্বামী হিসেবে গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। এ সময় হযরত আলী (রা.) উল্লেখ করেন, “আমার বিশ্বাস, আরব-আজমের দু'টি কুলীন রক্তধারার মহা মিলনের ফলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দুনিয়ার সেরা প্রতিভাবান সন্তান দান করবেন।”

শেরে খোদা মওলা আলীর (রা.) এ আশাবাদ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আক্ষরিক অর্থে বাস্তবায়ন করেছেন। সম্রাট কন্যাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ১. ইলমে ত্বরিকতের অন্যতম সাধক-পথিকৃৎ, অলি কুলের শিরোমণি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী আসগর ইবনে হোসাইন (রা.), ২. ইলমে ফিকাহ্'র অন্যতম দিকপাল হযরত ছালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রহ.), ৩. ইমাম কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দিক (রহ.)।

শেষোক্ত জন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা.) একান্ত সান্নিধ্য ও স্নেহে লালিত এবং মা আয়েশার প্রজ্ঞাবর্ণিত হাদিসসমূহের সর্বপ্রধান ভাষ্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উল্লেখ করা সঙ্গত যে ত্বরিকতের শাজরাসমূহের শীর্ষদেশে চতুর্থ জন হিসেবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন ইবনে হোসাইন (রা.)'র নাম চোখে পড়ে। ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার শাজরায় হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) নাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর পরে অন্তর্ভূক্ত আছে।

হযরত আলী (রা.) বর্ণিত আরব আজমের কুলীন ধারা সম্পর্কিত তথ্য

আরবের কুলীন ধারা হচ্ছে তৎকালীন পৃথিবী জুড়ে সুপরিচিত কুরাইশ বংশ। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ খান্দান বনি হাশিম। বনি হাশিম থেকেই রাসুলে খোদা (দ.)'র আবির্ভাব। আর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র আহলে বাইত হলেন আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয়জন। আহলে বাইতে রাসুল (দ.) পাক পাঞ্জাতনের পবিত্রতম শোণিতের উত্তরাধিকারী হলেন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)।

পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদগেরদ্ ছিলেন পারস্যের খ্যাতিমান সম্রাট নওশিরওয়াঁ এর উত্তর পুরুষ। সম্রাট নওশিরওয়াঁ সম্পর্কে হযরত শেখ সা'দী (রহ.) তাঁর গুলিস্তাঁ কাব্যে উল্লেখ করেন, "কারুন হারাক শোদকে চেহেল খানা গঞ্জে দাশত, নওশিরওয়ান নামরুদ কে নামে নেকু গোশাত।" অর্থাৎ বাদশাহ্ কারুন চল্লিশ কোঠরী মালের মালিক হয়েও ধ্বংস হয়ে গেছে। আর নওশিরাওয়াঁ বাদশাহ্ সুনামের কারণে মৃত্যুবরণ করেও মূলতঃ মৃত্যুবরণ করেননি। তাঁর সুনাম চিরদিন লোকমুখে শোনা যাবে। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করে হযরত শেখ সা'দী (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। বর্ণিত ঘটনা হচ্ছে– একদিন বাদশাহ্ নওশিরওয়াঁ শিকারে গিয়ে শিকার করে সেখানে বসে গোশ্ত কাবাব করছিলেন। ঘটনাক্রমে কাবাব করার কালে লবণ ছিল না। বাদশাহের এক খাদেম লবণ আনার জন্যে লোকালয়ে যান। তখন বাদশাহ্ তাকে ডেকে বলেন, মূল্য দিয়ে লবণ আনবে, অন্যথায় গ্রামে এক খারাপ পদ্ধতি প্রচলন হবে এবং গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে। প্রত্যুত্তরে খাদেম বলেন যে, সামান্য জিনিসের পরিমাণে কী ক্ষতি হবে? বাদশাহ্ বলেন, এ পৃথিবীতে প্রথমে জুলুমের পরিমাণ সামান্য দিয়ে ভিত্তি করা হয়েছিল; পরে যে এসেছে, সেই এর উপর বৃদ্ধি করেছে। তাতেই এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। সম্রাট নওশিরওয়াঁ'র সতর্কতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত শেখ সা'দী (রহ.) উল্লেখ করেন, "যদি প্রজাদের বাগান হতে বাদশাহ্ একটি করে সেব ফল খায় তাহলে বাদশাহ্'র খাদেমরা ঐ গাছের শেকড় উঠিয়ে নিবে। যদি বাদশাহ্ পাঁচটি ডিম জুলুম করে খায়, তাহলে বাদশাহ্'র সৈন্যরা হাজার হাজার মোরগ মেরে শিক্ কাবাব করে খাবে।" সম্রাট নওশিরওয়াঁ মৃত্যুর সময় পুত্র হরমুজকে নছিহত করে বলেন, "তোমার অন্তর সর্বদা গরীব ও দরবেশের দিকে অনুপ্রাণিত রেখো শুধু নিজের শান্তির জন্যে চিন্তা করবে না। যদি তুমি নিজের শান্তি চাও, তাহলে তোমার রাজ্যে প্রজাদের কখনো শান্তি ও আরাম হবে না। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা পছন্দ করবেন না যে, রাখাল রাতে ঘুমিয়ে থাকবে এবং বকরির পালে চিতাবাঘ পড়বে। মুখাপেক্ষী গরীব দরবেশদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, কেননা প্রজাদের কারণেই বাদশাহ্

সম্মানিত হন এবং রাজত্ব স্থায়ী হয়।" সম্রাট নওশিরওয়াঁন সম্পর্কে মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি তাঁর 'শাহনামা' মহাকাব্যে উল্লেখ করেছেন, "সারা বিশ্বকে এভাবে তিনি ন্যায়ের শাসনে পূর্ণ করেন/ সমস্ত অনাবাদি ভূমিকে করেন আবাদ/ উঁচু-নীচু সকলে নির্ভয়ে-নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেত পথে-প্রান্তরে/ মেষ ও নেকড়ে নির্ভয়ে পানি পান করত একই ঘাটে।"

পারস্য সাম্রাজ্য পরিচালনায় সম্রাট নওশিরওয়াঁ এর উপর্যুক্ত কাজ এবং ঘটনাপঞ্জীতে সুস্পষ্টভাবে হযরত আলী (ক.) বর্ণিত কুলীন জ্ঞানীয় স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ ধরনের কুলীন ধারার উত্তরাধিকারী হলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর মাতা হযরত শহর বানু। জ্ঞানের দরজা হযরত আলী (রা.) তাই পারস্য রাজ কন্যাদের আজমের কুলীন ধারা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর পুত পবিত্র চরিত্র এবং কর্মনীতিতে আর্য ধারার অহমিকা নয় বরং বিশ্বনবি (দ.), হযরত ফাতিমা (রা.), মাওলা আলী (রা.) এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের আদর্শ অনুশীলনই ছিল মৌলিক ও সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম ও বাল্যকাল

বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সম্রাট ইয়াজদগেরদ এর কন্যা শহর বানুকে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। তাঁর নতুন নাম রাখা হয় 'গাজালা'। রাজকীয় ঐতিহ্য-আর্য মেধা গুণে তিনি অতি দ্রুত নববি স্নিগ্ধতা, সুউচ্চ সাংস্কৃতিক ধারা, আচার-অভ্যাস এবং ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, তাওহীদি বার্তা সহজে রপ্ত করে নেন। শেরে ইলাহী হযরত আলী (রা.) এর হেকমত এবং পিতৃস্নেহ পারস্য সম্রাটের ভাগ্য বিড়ম্বিত কন্যাদের সৌভাগ্যের ইমারত রচিত হয়। পারিবারিক জীবনেও নব পুত্রবধুকে হযরত আলী (রা.) পিতৃস্নেহ এবং মমতায় আপ্লুত করে রাখেন।

ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা এবং স্বামীগৃহে আল্লাহ্‌র প্রতি পরম আনুগত্য ও সমর্পিত জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করে শহর বানু নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতে থাকেন। সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র শোণিতধারা, পৃথিবীর বুকে নন্দিত-প্রশংসিত ঘরানার বধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় অতীতের ভোগ-বিলাসী জীবন এবং নয়নাভিরাম-চাকচিক্যময় জৌলুস, সেবক-সেবিকাদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যা এবং পিতা ও সাম্রাজ্য হারানোর বেদনা তিনি দ্রুত ভুলে যান। তাই নতুন জীবনে তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব পরম প্রিয়তম স্বামী হযরত হোসাইন (রা.)'র সেবা-যত্ন দিয়ে সংসারকে আনন্দময় রাখার লক্ষ্যে নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখেন। এধরনের অতুলনীয় পারিবারিক ঐতিহ্যে নিজেকে বধু হিসেবে সমর্পিত করতে পারায় তিনি করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট সর্বক্ষণ শোকরিয়া আদায় করতে থাকেন।

গৃহবধু হিসেবে তিনি মনের গভীরে একটি স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এ ধরনের ঐতিহ্যময় পরিবারে যদি মহান আল্লাহ্‌ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন তাহলে তাঁর জন্ম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নয়ন জল বিসর্জন করে তিনি তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ব্যক্ত করে নিজেকে আল্লাহ্‌র দাসী হিসেবে সমর্পিত করে বিনীত ভাষায় উল্লেখ

করেন যে, "ইয়া ইলাহী! সবকিছু ছিন্ন-ভিন্ন এবং বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হবার পরেও আপনার পরম অনুগ্রহে আজ সর্বোত্তম পারিবারিক পরিবেশে বধু হবার সৌভাগ্য আপনি দান করেছেন। আমার অন্তরের একান্ত সাধ এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়া। ইয়া ইলাহী! আপনি পরম অনুগ্রহে আমার সাধ পূরণ করুন। আপনি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আমার এ ভিক্ষা এবং মনের সাধ আপনি সহজেই পূরণ করতে পারেন।" শহর বানুর একান্ত বাসনা যদি আল্লাহ্ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করে অনুগৃহীত করেন তাঁর নাম রাখবেন "আলী"। পারস্য সাম্রাজ্যের জৌলুসময় জীবন হারিয়ে যখন তিন বোন নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে দিশেহারা অবস্থায় পতিত হন তখন যে মহামানবের প্রজ্ঞাময় সিদ্ধান্ত তাঁদেরকে ইসলামী ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লীন হবার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁর পবিত্র নাম "আলী"। তাই এই স্মৃতিকে স্থায়ী রাখার জন্যে তিনি তাঁর সন্তানের নাম "আলী" রাখার অভিমত স্বামীর নিকট ব্যক্ত করেন।

মহান আল্লাহ্ শহর বানুর একান্ত অভিপ্রায় পূরণ করে তাঁকে পুত্র সন্তান দানের মাধ্যমে করুণাসিক্ত করেন। নবজাতকের শশীপূর্ণ মুখ দেখে তিনি আল্লাহ্র দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্র একান্ত ইচ্ছা জ্ঞাত হবার সাধ্য কারো নেই। আতুড় ঘরে শহর বানু ইহধাম ত্যাগ করেন। আতুড় ঘরেই মাতৃহীন নবজাতকের লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত হোসাইন (রা.)'র অন্য স্ত্রীর উপর। মাতৃবাসনা অনুযায়ী শিশুর নাম রাখা হয় আলী আসগর। উল্লেখ্য যে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র প্রথম পুত্রের নাম আলী আকবর। যে স্ত্রীর উপর ইমাম যয়নুল আবেদীনের লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি এক সময় ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর এই স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। ফলে পরম মাতৃস্নেহে তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে লালন-পালন ও সেবাযত্ন করতে থাকেন। আলী আসগরের প্রতি এ মহিলার পুত্রস্নেহ এবং সোহাগ-যত্ন এতো অধিক ছিল যে, হযরত যয়নুল আবেদীন বেশ বড় হবার পরেও জানতেন না, "এ মহিলা তাঁর গর্ভধারিনী মাতা নন।" প্রধানত মাতৃশোক জাগতে পারে এ আশংকায় পরিবারের সকলে বিষয়টি খুবই গোপন রাখেন। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের নিকট যখন ঘটনাটি প্রকাশ পায় তখনো তিনি তা বিশ্বাস করেননি। মাতৃস্নেহের আধিক্যই তিনি তা কখনো টের করতে পারেননি। তবে সব সময় তিনি তাঁকে মায়ের মতো পরম শ্রদ্ধায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সৎ মায়ের প্রতি তাঁর পরম ভক্তি এবং মায়ের স্নেহ এতো অত্যধিক ছিল যে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে দাসীর সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন ঐতিহ্যবাহী রাজ কন্যার সন্তান।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-দীক্ষা

ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন ওরফে হযরত আলী আসগর (রা.) যখন কথাবার্তা বলা শুরু করেন তখনই তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি শুরু হয়। পরিবারের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে তিনিও মসজিদে নববিতে গমন করে আস্তে আস্তে শিক্ষার প্রতি একাগ্র হয়ে পড়েন। অতি অল্প বয়সে তিনি পবিত্র কোরআন হেফজ করেন। মসজিদে নববি এমনিতেই ইলম অর্জনের সর্বোত্তম স্থান হিসেবে বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তখনো যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বরাই এ শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করতেন।

শিক্ষকবৃন্দের পরিচিতি

মসজিদে নববিতে যাঁরা তখন জ্ঞান বিতরণ ও শিক্ষাদান কার্যক্রমে নেতৃত্বদান করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)। পবিত্র কোরআনের মৌলিক তাফসীরকারক এবং ব্যাখ্যাতা ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (দ.)। এরপর হলেন শেরে ইলাহী হযরত আলী মর্তুজা (রা.)। তাঁর পর ইলমে তাফসীর এর ইমাম হিসেবে সকলে যাঁকে বরণ করে নেন তিনি হলেন হযরত আব্বাস (রা.) এর সুযোগ্য সন্তান হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)। অল্প বয়সে তিনি বিশ্বনবি (দ.)'র সাহচর্য প্রাপ্ত হন। একবার বিশ্বনবি (দ.) যখন হযরত দাহিয়া কলবী'র (রা.) ছুরতে আসা হযরত জিবরাইল (আ.) এর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত জিবরাইল (আ.)-কে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তবে তিনি তাঁকে চিনতে পারেননি। হযরত জিবরাঈল (আ.) চলে যাবার পর পর বিশ্বনবি (দ.) বিষয়টি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে অবহিত করেন। তাফসীর সম্পর্কিত আলোচনায় হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) কে পাশে বসিয়ে রাখতেন। তুলনামূলকভাবে কম বয়স্ক সাহাবাকে পাশে বসানোর বিষয়ে কোন কোন সাহাবী প্রশ্ন উত্থাপন করলে হযরত উমর তখন তাফসীর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলার জন্যে আহ্বান করতেন। এ সময় তাঁর জ্ঞান এবং পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা শুনে সকলে অবাক হয়ে যেতেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে এতোই স্নেহ করতেন যে, পরবর্তী খলিফা নিযুক্তির বিষয়েও তিনি একবার তাঁর সঙ্গে একান্তে কথোপকথনে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ইলমে ফিকহ্ এর ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত মনীষী সাহাবী **হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)**। তিনি ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। এ কারণে তিনি অহর্নিশ বিশ্বনবি (দ.) এর সাক্ষাত প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হয়েছেন। সুউচ্চ নৈতিক মান ধারণ করার কারণে তিনি সাহাবাদের নিকট বিশেষভাবে শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। বাল্যকাল হতে তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রাবল্যে উদ্ভাসিত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি এক ব্যক্তির বকরীর রাখাল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। একবার তিনি মাঠে বকরী চরাচ্ছিলেন। এসময় বিশ্বনবি (দ.) জনৈক সাহাবীসহ মাঠের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন তাঁরা উভয়েই ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। বালক ইবনে মাসউদকে দেখে বিশ্বনবি (দ.) বলেন, "বালক! আমরা উভয়ই খুবই ক্ষুধার্ত। তুমি একটি ছাগল থেকে দুধ দু'য়ে কিছু দুধ দাও। আমরা পান করে ক্ষুধা নিবারণ করি।" তখন বালক ইবনে মাসউদ বলেন, "বকরী পালের মালিক এখানে নেই। আমি কিভাবে অপরের বকরীর দুধ দু'য়ে নিতে পারি? আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।" রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বালকের এহেন ন্যায়ানুবর্তিতা দেখে খুবই খুশি হন এবং তাঁকে দোয়া করেন। পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিশ্বনবি (দ.) এর গভীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। তিনি ইসলাম ধর্মের জন্য প্রাণোৎসর্গের লক্ষ্যে সদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি সব সময় বিশ্বনবি (দ.) এর খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। বদর এবং উহুদ যুদ্ধে তিনি রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর অন্যতম দেহরক্ষী ছিলেন। বদর যুদ্ধে ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু আবু জেহেলের শিরশ্ছেদ করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)। গৃহে কিংবা প্রবাসে তিনি সর্বাবস্থায় বিশ্বনবি (দ.) এর সঙ্গে থাকতেন এবং সেবা শুশ্রুষা করতেন। লোকেরা তাঁকে বিশ্বনবি (দ.) এর পরিবার ভুক্ত মনে করতেন। পবিত্র কোরআন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁকে অস্থির মস্তিকে-ভরপুর লোকালয় কুফায় প্রেরণ করেন এবং লিখে পাঠান যে, "তোমরা ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।" পরে

তিনি কুফার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ পদে তাঁর হিসাব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিখুঁত এবং পরিচ্ছন্ন। হযরত উমর ফারুক ফিকাহ্ আলোচনায় ছয়জন সাহাবীর সঙ্গে একান্তে বসতেন। তাঁরা হলেন হযরত আলী (রা.), হযরত উবাই (রা.), হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) স্বয়ং। এই ছয়জন ছিলেন ফিকাহ্ শাস্ত্রের ছয়টি স্তম্ভ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) এর মতো বিচক্ষণ, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ (ফিকাহ্) ছিলেন মসজিদে নববি'র শিক্ষক।

হাদিস শরিফের ওস্তাদ ছিলেন **হযরত আবু হোরাইরা (রা.)**। সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে। তিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। নিয়মিতভাবে বিশ্বনবি (দ.) থেকে তিনি শরিয়ত এবং তাসাওউফ সম্পর্কে বিভিন্নমুখী ধারণা প্রাপ্ত হন। তিনি নিজে উল্লেখ করেছেন, "আমি রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর নিকট থেকে দু প্রকার জ্ঞান লাভ করেছি। প্রথম প্রকার যা শরিয়তসম্মত জীবন ব্যবস্থার জন্য, যা সকলের কাছে তিনি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার বাতেনি জ্ঞান যা লোক সমাজে প্রকাশ করলে তোমরা আমার খাদ্যনালী কেটে ফেলবে।" অর্থাৎ এটি মূলতঃ অতি তাত্ত্বিক এবং গভীর অনুধ্যানমূলক। যা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি রহস্যের বিষয় এবং সাধারণ্যে প্রকাশিতব্য নয়।

ব্যক্তি হিসেবে হযরত আবু হোরাইরা (রা.) ছিলেন দৃশ্যত বেরিয়া প্রকৃতির। কিন্তু তিনি ছিলেন সুউচ্চ নৈতিকমান ও সততার পথিকৃৎ। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এ পদে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ দিরহাম বার্ষিক রাজস্ব আদায় করে বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন। তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রাথমিক যুগের মনীষী হওয়া সত্ত্বেও সরকারী পদ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ রেখেছেন যে, ইসলাম ধর্মের সামাজিক ও ব্যবহারিক দিক মূলতঃ তাসাওউফ নির্ভর। অর্থাৎ সুউচ্চ নৈতিক শিক্ষা, আচরণ ও ব্যবহার শাস্ত্র প্রধানত তাসাওউফ সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এ ধরনের অতি উন্নত মানসিক চেতনা সমৃদ্ধ প্রাজ্ঞজনের নিকট হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) শিক্ষা অর্জন করেন।

উম্মুল মু'মিনীন (রা.) সমীপে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল উম্মুল মু'মিনীনদের (রা.) গৃহে যাতায়াত করা। মসজিদে নববিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় পাঠান্তে তিনি শিশুকিশোরদের নিয়ে প্রায়শঃ উম্মুল মু'মিনীনদের খেদমতে হাজির হতেন। তাঁরা উম্মুল মু'মিনীনদের নিকট থেকে বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্র জীবন সাধনার সঙ্গে জড়িত

বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে জ্ঞান লাভ করতেন। রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র অবয়ব, আচার-আচরণ, অভ্যাস, দিনপঞ্জী কিভাবে অতিবাহিত হতো সে সম্পর্কে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হতেন। রাসুল (দ.) এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এর পৌত্র, শেরে খোদা হযরত আলীর (রা.) পৌত্র, শোহাদায়ে কারবালার অমিত তেজ সাহসী বীর রাসুল (দ.) এর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রা.) এর মাতৃহারা পুত্রকে উম্মুল মু'মিনীনগণ খুবই স্নেহ করতেন। একই সঙ্গে তিনি মসজিদে নববিতে নিয়োজিত সকল শিক্ষকদের নিকট ছিলেন বিশেষভাবে সমাদৃত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম মেধা, ধীশক্তি, স্মরণ শক্তি এবং বোধ বিবেচনা সম্পন্ন মহামানবের প্রতিমূর্তি। এজন্যে অতি অল্প বয়সে তিনি বড় বড় জ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার অধিকার প্রাপ্ত হন। জ্ঞানীরাও তাঁর সঙ্গে যে কোন জটিল বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় রত হতেন। ছাত্র কিশোর হলেও তাঁর সঙ্গে মতবিনিময়ে তাঁরা উৎফুল্ল হতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মাতৃভক্তি এবং বিভিন্ন আচরণ প্রসঙ্গ

মাতৃভক্তির অনুপম দৃষ্টান্ত রেখেছেন হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)। নিজের গর্ভজাত সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রতি সৎ মা যে ধরনের মায়া-মমতা এবং পরম স্নেহের পরশে বড় করেছেন তাঁর প্রতি ইমামের ভক্তি-শ্রদ্ধাও ছিল বর্ণনাতীত। এক মুহূর্তের জন্যেও সৎ মা তাঁকে মায়ের অভাব অনুভব করতে দেননি। একই সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সৎ মাকে কখনো বুঝতে দেননি তিনি নিঃসন্তান। সৎ মা গর্ভধারিণী নন, এ তথ্য জানার পর মায়ের প্রতি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর ভক্তি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। মা ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে নিজ হাতে খাবার খাইয়ে দিতেন। কিন্তু মা আগে কিছু না খাওয়া পর্যন্ত কখনো ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) খাবার খেতে রাজি হতেন না। এটি পারস্পরিক মায়া-মমতা এবং আন্তরিকতার অপূর্ব নিদর্শন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর এধরনের মাতৃভক্তি থেকে সৎ মায়ের প্রতি সন্তানের আচরণ সম্পর্কে শিক্ষনীয় অনেক কিছু রয়েছে।

দাস-দাসীর প্রতি মানবিক সম-মর্যাদা সম্পর্কিত আচরণ প্রসঙ্গ

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সৎ মা ছিলেন মূলতঃ ক্রীতদাসী। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর পরই ক্রীতদাসীর বুকে পরম যত্নে লালিত হওয়ায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) দাসদাসীর কল্যাণ, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এবং মুক্ত মানুষের মতো সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সৎ মা তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। গ্রীক সভ্যতা দাস প্রথাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপরিহার্য পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অ্যারিস্টটলের মতো বিশ্ব বিশ্রুত সমাজবিজ্ঞানীও দাস প্রথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, দাসরা মূলতঃ গৃহের অন্যান্য আসবাব সামগ্রীর মতোই প্রভুর খেদমতে একাগ্র থাকবে এবং প্রভুর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অ্যারিস্টটল

দাসদেরকে নির্বোধ প্রকৃতির জীবের মতোই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। দুর্ধর্ষ ফেরাউন মিসরে বনি ইসরাইলী পুরুষ-মহিলাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে অপমর্যাদায় রেখে কিবতীদের সেবা কর্মকেই তাদের পেশা হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিল। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনেও বনি ইসরাইলীদের প্রতি কিবতীদের আচরণের বিবরণ রয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের কালে বিশ্বনবি (দ.) দাস-দাসীদের প্রতি মানবিক আচরণ এবং সমাজে মনুষ্যজাত অধিকার প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্বনবি (দ.) এর অনেক বিশিষ্ট সাহাবা ছিলেন ক্রীতদাস-দাসী, অর্থাৎ সমাজে উপেক্ষিত মানুষ। বিদায় হজের অবিস্মরণীয় ভাষণে বিশ্বনবি (দ.) দাস-দাসীদের সামাজিক সমমর্যাদা সুরক্ষার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফত কালে দাস-দাসীদের মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন, সমানাধিকার এবং মানব-মর্যাদা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সর্বপ্রথম জারী হয়। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ইসলাম ধর্মের মানবাধিকার সম্পর্কিত বাস্তবানুগ নির্দেশনা কার্যকর করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা এবং সমআচরণ ভিত্তিক কার্যাবলী ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব দৃশ্যমান করে তোলে। অতি মর্যাদামান সৈয়দজাদা এবং পাক-পাঞ্জাতনের পবিত্র শোণিতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) হযরত উমর ফারুক (রা.) এর গোলাম আসলামের জ্ঞানচর্চার মজলিসে প্রায় সময় যোগ দিতেন। এ বিষয়ে লোকে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দিতেন, "যার মন যেখানে সায় দেয় এবং মমত্ব রাখে সেখানে বসা ও গমন করা বাস্তব সম্মত বিষয়।"

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ এবং সংকটের মুখে ইমাম পরিবার

খোলাফায়ে রাশেদীন এর চতুর্থ খলিফা, বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র ইলম ভাণ্ডারের দরজা হযরত আলী (রা.)'র খিলাফত সময় অতিবাহিত হয় একদিকে সততা, ন্যায়বোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, সুউচ্চমানের নৈতিকতা, তাসাওউফ ধারায় আত্মনিয়ন্ত্রিত বিশুদ্ধতা, অন্যদিকে শঠতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যা, অর্থ-ক্ষমতা লোভী, প্রবৃত্তি পূজারী দুর্বৃত্তের দুষ্ট দাম্ভিকতার চরম দ্বন্দ্ব, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। হযরত আলী (রা.) খিলাফত সময়ে জঙ্গে জামাল (একটি অনর্থ যুদ্ধ), সত্য-মিথ্যার ফয়সালা সম্পর্কিত সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ, অস্থির মতি, নৈরাজ্যবাদী খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার অনুসারীদের দমন, নিশাপুরে পারস্য সম্রাট খসরুর কন্যা সৃষ্ট বিদ্রোহ দমন প্রভৃতি সম্পন্নের মাধ্যমে খিলাফতে বসবাসরত জন সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ভয়ঙ্কর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বন্ধের নিমিত্তে সাহাবাদের পরামর্শে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা দুমাতুল-জন্দলে সালিশী সিদ্ধান্ত ঘোষণায় আমর ইবনুল আসের অনৈতিক প্রস্তাবের মুখে সমস্ত ফয়সালাটি অচিন্তনীয় ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়। এটিকে সরল, অকপট, নীতিজ্ঞানের পরাজয় এবং ফন্দিবাজী, কপটতা, ভণ্ডামীর বিজয় হিসেবে ইতিহাসবিদরা চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের নানামুখী ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের একপর্যায়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়তমদের একজন হযরত আলী (রা.) শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা আহলে বাইতের জীবন ধারায় প্রথম সংকট।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মাওলা আলী (রা.) ভবিষ্যত খলিফা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেননি। তবে কুফা, ইরাক, পবিত্র মক্কা-মদিনার অভিভাবক তুল্য সাহাবা এবং সাধারণ জনগণ রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এর দৌহিত্র, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.) এবং মাওলা আলীর (রা.) প্রথম পুত্র পাক পাঞ্জাতনের চতুর্থজন হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে পঞ্চম খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত জ্ঞানী, ধীর স্থির, নির্ভীক, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, সরল, শান্তিপ্রিয় এবং নির্বিরোধী তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব। তাঁর খলিফা নিযুক্তি সিরিয়ার গভর্ণর আমীর মুয়াবিয়া চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কুফা আক্রমণের লক্ষ্যে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে ইরাক অভিমুখে রওনা হন। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে খলিফা হযরত হাসান (রা.) চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্যোগ নেন। কিন্তু নবি বংশের পবিত্রতম শোণিতের ধারক, জিল্লু নবুয়তের ছায়াধারী, বিশ্বনবি (দ.) এর গুপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার বেলায়তের জিম্মাদার হযরত ইমাম হাসান (রা.) মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে অন্তকলহ, রক্তপাত, বিভক্তি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সব সময় তিনি বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে একাগ্র ছিলেন।

মহান আলীর (রা.) সময়ে সংঘটিত রক্তপাতের পরিণাম আহলে বাইতের শান্তিপ্রিয় জীবন ধারায় যে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছে তা হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে-বিশ্বনবি (দ.) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর শাহাদাত। তাই তিনি উম্মাহ্‌র স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আমীর মুয়াবিয়া প্রেরিত সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করে মোট সাতমাস ছাব্বিশ দিন পর খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এই নির্দিষ্ট সময়েই বিশ্বনবি (দ.) ঘোষিত খোলাফায়ে রাশেদীন এর ত্রিশ বৎসরও পরিপূর্ণ হয়।

শত্রুর গভীর ষড়যন্ত্রে প্রয়োগ করা বিষক্রিয়ায় শাহাদাত প্রাপ্ত হযরত ইমাম হাসান (রা.)

সন্ধির মাধ্যমে খিলাফত পরিত্যাগ করার পর হযরত ইমাম হাসান (রা.) কুফা থেকে ইমাম বংশের সকল সদস্যদের নিয়ে মদিনা শরিফে চলে আসেন। সব সময় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হযরত ইমাম হাসান (রা.) রাজনীতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনীহ হয়ে উঠেন। বরং তিনি প্রতিদিন আগত নিত্য-নতুন লোকের মধ্যে হেদায়তের বাণী প্রচারে একাগ্র হয়ে যান। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের মাঝে সুউচ্চ নৈতিক মান গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি নিত্য আগত জনগণের মধ্যে তাসাওউফ জ্ঞান অনুশীলনে উজ্জীবিত করার শিক্ষাদান শুরু করেন। এটি মূলতঃ বিশ্বনবি (দ.) প্রবর্তিত “মোর‍্যাল ব্রিগেড” সৃষ্টির একটি বিশেষ কর্মপন্থা। এ কর্মধারা নতুনভাবে

প্রবর্তনের মহান শিক্ষক হলেন হযরত ইমাম হাসান (রা.)। এটি হচ্ছে ইসলাম প্রচার এবং মানবিক গুণাবলী অর্জন সম্পর্কিত শান্তিপ্রিয় কর্মসূচি।

এতদ্‌সত্ত্বেও দামেস্কে ক্ষমতাসীন "সীজার চক্র" ইমাম পরিবারের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বন্ধ করেনি। কারণ সন্ধিচুক্তির একটি শর্ত আমীর মুয়াবিয়াকে পীড়িত ও ভাবিত করে রাখে। তা হচ্ছে আমীর মুয়াবিয়ার পর হযরত ইমাম হাসান (রা.) অথবা তৎপরিবর্তে তেজস্বী বীর পাক পাঞ্জাতনের পঞ্চমজন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) খিলাফত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। এটি দামেস্কের "সীজার চক্রের" জন্য ভয়ানক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে বংশানুক্রমিক রাজত্ব অবসানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তাই আহলে বাইতকে নিঃশেষ করার কু-পরিকল্পনা হিসেবে সর্বশ্রেণির মুসলিম জনতার পরম শ্রদ্ধাস্পদ হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে দুনিয়া থেকে অপসারণের চক্রান্ত শুরু হয়। মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসরত কুটিলা রমণী 'মায়মুনা'-কে দামেস্কের "সীজার চক্র" কুকার্য সম্পন্নের জন্যে নিয়োগ দেয়। অবশেষে এই কাল নাগিনীর গভীর ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে হযরত ইমাম হাসান (রা.) শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এ ঘটনা আহলে বাইত পরিবারে নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। সর্বত্র সৃষ্টি হয় শোকের মাতম। কিশোর বয়সে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে এধরনের শোকের অনুতাপে দগ্ধ হতে হয়।

কারবালার পটভূমি

মক্কা-মদিনা জুড়ে যখন হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র বিষ প্রয়োগে শাহাদাতের কারণে তীব্র শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছিল তখন সর্বত্র খবর আসে, দামেস্কে আমীর মুয়াবিয়া ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর আসনে পারিবারিক উত্তরাধিকার ভিত্তিক মনোনীত ইয়াজিদ সমাসীন হয়েছে। আমীর মুয়াবিয়া মনোনীত শাসক ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন হয়ে আনুগত্যের শপথ আদায় করার জন্যে জনগণের উপর অন্যায় চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। সে তার পিতৃতুল্য সাহাবা কেরামের উপর চাপ সৃষ্টি করে। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, আমীর মুয়াবিয়ার উত্তরাধিকার নির্ণয়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রঙ্গীন শরাব, শিকার ও পর্যটনের সঙ্গে অহর্নিশ জড়িত ইয়াজিদের মতো দুর্বৃত্ত জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টির সুযোগ পায়। অথচ বিশ্বনবি (দ.) এ ধরনের উত্তরাধিকার মনোনয়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। সিয়াসত বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে তাসাওউফের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ফলে তখন সিয়াসতের পার্থিবতা এবং পরকালের জবাবদিহিতা ও ফলাফল একই ধারায় অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের বিলুপ্তির পর আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে কার্যত ইসলাম ধর্মের মূলধারার সঙ্গে নৈতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পরিণতিতে

ইয়াজিদের মতো মদ্যপ দুষ্কর্মে পারদর্শী ব্যক্তি মুসলিম শাসক হিসেবে চেপে বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসাইনের জিহাদ এবং কারবালার রক্তাক্ত প্রান্তর সৃষ্টির মূল কারণ এখানে নিহিত আছে।

ইয়াজিদ পিতৃ নির্দেশনা অনুযায়ী তার প্রতি আনুগত্যের শপথ আদায়ের লক্ষ্যে পবিত্র নগরী মদিনায় অবস্থানরত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) এর সম্মতি আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করে মদিনার গভর্নর ওলীদ ইবনে উতবা'র উপর। তিনি উপর্যুক্ত চারজনের আনুগত্যের শপথ আদায়ে ব্যর্থ হন। ইয়াজিদের মূল লক্ষ্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.)'র আনুগত্য আদায়। কারণ অহর্নিশ ইবাদত এবং ধ্যানে মশগুল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) পিতার অছিয়তের কারণে খিলাফতের জন্য মোটেও ইচ্ছুক নন। অন্যদিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরও খিলাফতের বিষয়ে আগ্রহী নন। তাই যে কোন প্রকারে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর আনুগত্য আদায় করা গেলে অন্য কোন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব ইয়াজিদের কার্য সম্পাদনে বাধা হবেন না। আমীর মুয়াবিয়া এবং ইয়াজিদ ভাল করেই জানতেন সাধারণ মুসলিম জন সমাজে বিশ্বনবি (দ.) এর দৌহিত্র পবিত্রতম হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) সম্মান এবং প্রভাব অতুলনীয়। নবি (দ.) এর বংশের বিষয়টি উম্মাহ্‌র নিকট অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁর প্রতি আঘাত মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। তাই কুট কৌশলে ইয়াজিদ তাঁর বশ্যতা আদায়ে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তাওহীদি সূর্যের প্রতীক, সত্য এবং ন্যায় পথের অসীম সাহসী বীর, আপোসহীন চরিত্রের অনন্য নজীর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) দুষ্কর্মা ইয়াজিদের হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। কারণ ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার হচ্ছে বিশ্বনবি (দ.) নির্দেশিত কর্মপন্থা, তাওহীদ এবং সার্বিক অর্থে অন্যায়-অপকর্ম-জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধর্মবিধান ইসলামের আত্মসমর্পণ ও পরাজয়। তাই হযরত ইমাম হোসাইন বিশ্বনবি (দ.) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের কাফেলা এবং তাওহীদি নিশানকে সর্বোচ্চে উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে জীবন বিসর্জনের প্রত্যয় নিয়ে পবিত্র মদিনা-মক্কা জিয়ারত সম্পন্ন করে আহলে বাইতের পবিত্রতম সদস্যদের নিয়ে কুফার পথে এগিয়ে যান। তখন তাঁর সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে অসুস্থ কিশোর হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)ও ছিলেন। **হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কুফায় গমনের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "যখন আমরা কুফা অভিমুখে যাত্রা করি, তখন সফর ও অবস্থানের প্রতিটি জায়গায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে**

যাকারিয়া (আ.)-কে স্মরণ করেছেন। একদিন তিনি বলেন, পৃথিবীর লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের প্রমাণ এই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়ার (আ.) পবিত্র শির এক মহিলার মাধ্যমে বনি ইসরাইলের অপদার্থের কাছে উপহার স্বরূপ পেশ করা হয়েছিল।" এটি ছিল মূলতঃ কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইতের বিষাদঘন করুন পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর ইঙ্গিত পূর্ণ উক্তি।

কুফার পথে পরম পুণ্যশীল আহলে বাইত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কেন হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.)'র কথা বার বার স্মরণ করেছিলেন তা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, " হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের, যার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া, ইতিপূর্বে আমি কারো এ নাম রাখিনি" –(সূরা মরিয়ম : ৭)। অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.)'র পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)'র নাম স্বয়ং মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) যখন নবি হিসেবে আবির্ভূত হন, তখন বনি ইসরাইল দীর্ঘ সত্তর বছর পর বাবেলের গোলামী জীবন থেকে মুক্তি পায়। তিনি যখন আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাতে শুরু করেন তখন সাধারণ মানুষ দলে দলে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিতে থাকে। তাঁর প্রাণস্পর্শী উপদেশ নসীহত মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়। সাধারণ মানুষ হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা নিয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হতে থাকে। তিনি তাঁর উপদেশমূলক বক্তৃতায় হযরত ঈসা (আ.) এর আগমনের সুসংবাদ দিতেন। তিনি যে দিকেই যেতেন, দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে ভিড় জমাত। পতঙ্গকুল যেমন আলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মানুষের অবস্থাও তেমন হয়ে পড়ে। যেহেতু তিনি হযরত ঈসা (আ.) এর আগমনের সুসংবাদ দিতেন, এতে ইহুদীদের একটি দল তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। ইহুদীরা তাঁকে হত্যার জন্যে ফন্দি আঁটতে থাকে। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং পতঙ্গতুল্য আশেক-ভক্ত দেখে ইহুদী শাসক হেরোডোটাস তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাঁর প্রতি সন্দেহ-সংশয়ে ভুগতে থাকে।

এদিকে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে। তাঁর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তায় ভীত-শংকিত ইহুদী সম্প্রদায় এবং তাদের শাসক হেরোডোটাসের শত্রুতাও দিন দিন বেড়ে চলে। তাদের ভয় তুমুল জনপ্রিয় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) যদি শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন তাহলে এদের অবস্থা কেমন হবে? এধরনের দুর্ভাবনায় চিন্তাক্লিষ্ট হেরোডোটাস নানামুখী ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। এমনিতেই হেরোডোটাস হচ্ছে নিতান্ত পাপাচারী জননিপীড়ক, অত্যাচারী-জালেম দুঃশাসক। ফলে সে দুষ্কর্মের কারণে শাসন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত-শংকিত ছিল। এধরনের দুর্ভাবনা কালে হেরোডোটাসের বিমাতা ভাই ঘটনাচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত

বিমাতা ভাইয়ের স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী-রূপসী ছিল। এ রমনী একদিকে ভাইয়ের স্ত্রী, অন্যদিকে আত্মীয়তার সম্পর্কে হেরোডোটাসের ভাতিজী হতো। প্রেমাসক্ত হয়ে হেরোডোটাস রমনীকে বিয়ে করে। এ ধরনের বিয়ে তাওরাত ঘোষিত শরিয়তের বিরোধী ছিল। এজন্যে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) প্রকাশ্য জন সমাবেশে এ বিয়ের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি হেরোডোটাসকে তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করেন। একই সঙ্গে তিনি হেরোডোটাসকে মহান আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করে সংযত হবার উপদেশ দেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর বক্তব্যের বিষয় অবগত হয়ে হেরোডোটাসের প্রণয়িনী রাগে ক্ষোভে আল্লাহ্র প্রিয় নবিকে হত্যার জন্যে হেরোডোটাসকে প্ররোচিত করে। হেরোডোটাস যদিও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল তবুও তাঁকে হত্যার বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। কিন্তু প্রণয়িনীর হঠকারী মত এবং প্রচণ্ড চাপে হেরোডোটাস হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর শিরশ্ছেদ করে একটি তশ্তরীতে রেখে প্রণয়িনীর নিকট পাঠিয়ে দেয়। জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও জনগণ ভয়ে অভিশপ্ত হেরোডোটাসের অপকর্মে বাধা প্রদান, সমালোচনা বা তিরস্কার করার সাহস করেনি। বরং একদল হেরোডোটাসের অপকর্মকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) শহীদ হবার পর পূর্ব সুসংবাদের ফলস্বরূপ আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.)-কে অতি আশ্চর্যজনক ঐশী ঝলোয়ায় পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তিনি বনি ইসরাইলকে এক আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি ইহুদীদের উদ্ভাবিত কুপ্রথা, মুশরেকী রসম, জালিম স্বভাব, রীতি নীতি, আচার-আচরণের বিরুদ্ধে মৌখিক জিহাদ শুরু করেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর বাণীর প্রতি মোটেও কর্ণপাত করেনি। স্বল্প সংখ্যক মানুষ ব্যতীত সকলেই হযরত ঈসা (আ.) এর চরম বিরোধিতা শুরু করে। এসময় নেবুটি শাসক হারেস আক্রমণ চালিয়ে হেরোডোটাসের রাজ্য তছনছ করে দেয়। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নেবুটি শাসক হারেস হেরোডোটাসকে চরমভাবে পরাজিত করে। তবে রোমকদের সহায়তায় তখনো ইহুদীরা আশ্রিত রাজ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে। নেবুটি শাসকের নিকট চরম পরাজয় এবং রাজ্য তছনছ হবার বিষয়ে ইহুদীরা হেরোডোটাস কর্তৃক হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে দায়ী করে। এর পরেও ইহুদীরা কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা জালিম সুলভ অপতৎপরতা থেকে কখনো বিরত হয়নি। চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব নিয়ে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তৎকালীন শাসক প্লাটিসের অনুমতি নিয়ে তারা হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর অবস্থান স্থল ঘেরাও করে। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অসীম মহিমায় তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রকৃতভাবে খুঁজে পায়নি। আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। এ ধরনের বিচিত্র অপকর্ম এবং ঘটনায় অভিশপ্ত ইহুদীরা এখনো পৃথিবীর বুকে

আত্মমর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সর্বাবস্থায় এরা পরাশক্তির করুণার উপর ভর করে টিকে আছে। অথচ অপকর্মের কারণে এরা দুই সহস্রাধিক বছরের মতো নিরুদ্দিষ্ট এবং দিশেহারা জাতি হিসেবে ছত্রভঙ্গ ছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর বিষয় স্মরণ করে সৈয়্যদুশ্ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উম্মতে মুহাম্মদী (দ.)-কে অতীত ঘটনাপঞ্জী জ্ঞাত করে সজাগ করে দিয়েছেন। হেরোডোটাসের পত্নীর জন্যে তশ্তরীতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর কর্তিত পবিত্র শির উপহার হিসেবে যেমন প্রেরণ করা হয়েছিল তেমনি বিশ্বনবি (দ.) এর দৌহিত্র সৈয়্যদুশ্ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র শির বর্শা ফলকে উত্তোলন করে জালিম ইবনে যিয়াদ এবং বর্বর মদ্যপ ইয়াজিদের জন্য মুসলিম নামধারী মুনাফিক-অসভ্যরা প্রেরণ করেছিল। তুমুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর শিরশ্ছেদের জন্য যেমন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তেমনি পরম শ্রদ্ধা, হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা, অতুলনীয় জনসমর্থন থাকা সত্তেও জালিমের নির্মম অত্যাচারের ভয়ে কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রলয়ঙ্করী গণবিস্ফোরণ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। হযরত হোসাইন (রা.) কর্তৃক হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-কে স্মরণ করার পটভূমি কারবালার ঘটনার মধ্যে সন্নিহিত আছে।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আহলে বাইতের কাফেলা নিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন কারবালায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর সেখানে তিনি তাঁবু ফেলে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু নৃশংস বর্বর জালিম ইয়াজিদ মনোনীত গভর্নর ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ এর নির্দেশে ফোরাত নদী থেকে পানি সংগ্রহের সকল পথ দুর্বৃত্ত বাহিনী দিয়ে বন্ধ করে দেয়। শিশু-মহিলা-পুরুষ কেউই পানি সংগ্রহের অনুমতি বা সুযোগ পায়নি। এ ধরনের বর্বরদের মাধ্যমে খিলাফত, ইসলাম ধর্ম এবং আল্লাহ্-রাসুল সবই প্রতারণার খেল-তামশা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশে সিরিয় বাহিনী হযরত আলীর (রা.) সৈন্য এবং সমর্থকদের জন্যেও পানি সরবরাহ প্রশ্নে একই ধরনের অমানবিক ভূমিকা পালন করে। হযরত আলী (রা.) যুদ্ধের মাধ্যমে নদীর ঘাট নিয়ন্ত্রণ থেকে সিরিয় বাহিনীকে বিতাড়িত করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উভয় পক্ষের জন্যে পানি সংগ্রহের বিষয়টি উম্মুক্ত ও অবারিত করে দেন। হযরত আলী (ক.) সম্পাদিত এ ঘটনার মাধ্যমে আলো, বাতাস, পানি, সূর্যকিরণ প্রভৃতিতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য প্রাকৃতিক বিধান হিসেবে সম অধিকারের যে ঘোষণা দিয়েছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এ ঘটনার মর্মমূলে ইলমুল ইয়াকীন-হাক্কুল ইয়াকীন-আইনুল ইয়াকীন এবং ইহ্সানের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত আছে।

এদিকে কারবালার প্রান্তরে ইমাম শিবিরে নবজাতক শিশুসহ ভীষণ অসুস্থ কিশোর হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) পানির পিপাসায় কাতর হয়ে আছেন। হযরত যয়নুল আবেদীনের অসুস্থতার প্রকোপ এতো তীব্র হয় যে, তিনি বার বার মূর্ছাহত হচ্ছিলেন। তাঁর সেবা শুশ্রুষার জন্যে পানি দরকার, কিন্তু পানি নেই। কারবালা প্রান্তরে পানির পিপাসায় ইমাম শিবিরে হাহাকার অবস্থা চলছে, অন্য দিকে অসুস্থ হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) চরম শারিরীক দুর্বলতায় কাহিল হয়ে আছেন। এধরনের পরিস্থিতিতে ইয়াজিদ বাহিনী পূর্ণ রণ সাজে ময়দানে উপস্থিত হয়ে আহলে বাইত পরিবারের সদস্যদের আক্রমণ করে। হযরত হোসাইন (রা.) সঙ্গে সামান্য কয়েকজন সৈন্য বর্বরদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা প্রাপ্ত হন। শহীদের তাজা তপ্ত রক্তে সয়লাব কারবালা প্রান্তরে তখন হযরত ইমাম হোসাইনের কয়েকজন ভাই, জনাকয়েক খেদমতগার এবং মহিলাসহ সন্তানগণ অবশিষ্ট আছেন। একে একে ইমামের বৈমাত্রেয় ভাই আবু বকর, উমর, ওসমান, আউয়াল, যাফর, আবদুল্লাহ্ শত্রুর মোকাবিলায় শহীদ হন। ইতোমধ্যে শহীদ মুসলিমের সহোদর ভ্রাতা আব্বাস ইমাম শিবিরে পানি-পানি শব্দের কাতরানি শুনে মশক নিয়ে ফোরাতের দিকে এগিয়ে যান। মশক ভর্তি পানি নিয়ে আসার পথে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি নদীর তটেই শাহাদাত বরণ করেন।

এরূপ বর্বর বাহিনীর মোকাবিলায় রণ সাজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কন্যা সকিনার জামাতা মহাবীর হযরত কাসিম (রা.)। বেশ কয়েকজন দৈত্যসম শত্রু নিধন শেষে তিনি শহীদ হন। এরপর রণক্ষেত্রে হাজির হন বীরশ্রেষ্ঠ আলী আকবর (রা.)। বীরের এই প্রবহমান রক্তস্রোত ধারা অনেক শত্রু নিধন শেষে "হাওজে কাওসার"-এর পানি পানের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য স্বার্থান্ধ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। একই পন্থায় শাহাদাত বরণ করেন হযরত ইমাম হাসানের অপর পুত্র বীরবাহু আবদুল্লাহ্ (রা.)। হযরত ইমাম হোসাইনের অপর পুত্র আলী আসওয়াদ কিশোর হস্তে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধে শরিক হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। একে একে পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যের শাহাদাতে হযরত ইমাম হোসাইনের অন্তর নিঃসাড় হয়ে যায়। শিবিরে মহিলাদের বুকফাটা কান্না, আহাজারি চলছে। হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) আফসোস আহলে বাইতের সকল পুরুষ সদস্যই কি জালিম-বর্বরদের হাতে প্রাণ দিয়ে নবিজীর (দ.) বংশধারার ইতি ঘটাবেন। অথচ পবিত্র কোরআনে নবিজীর (দ.) আহাল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেন, **"(মহা বিচার দিবসে) আপনি জালিমদের তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবেন। কৃতকর্মের শাস্তি ওরা পাবেই। আর যারা বিশ্বাসী ও**

সৎকর্মশীল তারা জান্নাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে। তারা যা চাইবে প্রতিপালকের কাছে, তা-ই পাবে। আর এটা হবে তাদের প্রতি মহা-অনুগ্রহ। আর এই মহা-অনুগ্রহের সুসংবাদ আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের দিচ্ছেন। হে নবি! ওদের বলুন, এ সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন পুরস্কার চাইনা। আমি শুধু চাই তোমরা আমার অতি নিকটতম আপনজন ও আত্মীয়দেরকে নিকটাত্মীয়ের মতো ভালবাসবে"- (সূরা শুরা : ২২-২৩)।

এ আয়াত নাযিলের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বিশ্বনবি (দ.)'র নিকট বিনীত আরজ করেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (দ.)! আপনার এই নিকটতম আত্মীয় কারা, যাঁদের ভালবাসা সমগ্র উম্মতের উপর পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা ওয়াজিব করা হয়েছে। প্রত্যুত্তরে বিশ্বনবি (দ.) জানান, তাঁরা হলেন ১. হযরত আলী (রা.) ২. হযরত ফাতেমা (রা.) এবং তাঁদের দু'সন্তান ৩. হযরত হাসান (রা.) এবং ৪. হযরত হোসাইন (রা.) –(দুররে মনসুর : ৭ম খণ্ড)। পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং বিশ্বনবি (দ.) এর হাদিস শরিফ থাকা সত্ত্বেও যারা উন্মত্ত-উন্মাদ হয়ে বিশ্বনবি (দ.) এর আহলে বাইতকে বিভিন্নভাবে শহীদ করেছে উপর্যুক্ত আয়াতে এবং হাদিস শরিফে তাদের পরিণতি বিবৃত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর উপর বেলায়ত হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ

আহলে বাইত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রায় সকলে তাওহীদ, ইনসাফ, গণ অধিকার, বিচার সাম্য, মানবিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী সর্বশীর্ষে ধারণ করার অঙ্গীকার নিয়ে একে একে যখন শহীদ হয়ে যান তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নির্ভয়ে যুদ্ধসাজ পরিধান করে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হবার প্রস্তুতি নেন। তিনি স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি অন্তিম উপদেশ প্রদান করে বিদায় নেন। এসময় কনিষ্ঠ পুত্র হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) ভীষণ পীড়িত অবস্থায় বিবি উম্মে কুলসুমের তত্ত্বাবধানে শয্যাশায়ী ছিলেন। এধরনের বিষাদঘন করুণ পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সকলের প্রতি নিবেদন করেন, **"এ বালকটিকে তোমরা সযত্নে রক্ষা করবে। নবি (দ.) এর আধ্যাত্মিক গুপ্তধন 'বেলায়ত' যা নবি (দ.) আমার পিতার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং যা পরে আমার ভাই এবং আমি পিতার নিকট হতে লাভ করেছিলাম, তা এই বালকের বক্ষে আমানত রেখে আমি আজ দুনিয়া হতে বিদায় নিচ্ছি। আমার আশা, এই বালকের মারফতেই নবি (দ.) এর বেলায়ত অর্থাৎ রূহানী জগতের অনুশাসন দুনিয়ায় জারী থাকবে। দুনিয়ায় বিশ্বনবি (দ.) এর নবুয়তের আর কোন উত্তরাধিকারী হবে না, কিন্তু তাঁর 'বেলায়ত' ইমাম পরম্পরার ভিতর দিয়ে ছেদহীন অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত জাগ্রত থাকবে।"** (কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্, হাওলাদার প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা)। উপর্যুক্ত খুত্‌বা শেষে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজ বক্ষের সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর বক্ষ সজোরে চেপে ধরেন এবং বেশ কিছুক্ষণ নিমীলিত চক্ষে স্তব্ধ হয়ে থাকেন। এরপরে বালক যয়নুল আবেদীন (রা.) কে সস্নেহে চুম্বন করে তাঁর ফুফু আম্মা হযরত যয়নাব (রা.)'র জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেন। এভাবে বিশ্বনবি (দ.) এর গুপ্ত জ্ঞান হযরত ইমাম হোসাইন স্বীয়

পুত্রের পবিত্র বক্ষে সংরক্ষণ করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশ্য হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র পবিত্র বক্ষে সমর্পিত বেলায়ত হযরত হাসান মুসন্না (রা.)'র ধারাবাহিকতায় তাঁরই পরবর্তী পবিত্র প্রজন্মের মাধ্যমে গাউসুল আযম অভিধায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত এবং হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) এর ত্বরিকতের ইমামত গ্রহণ

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর, ষাট হিজরীর ১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে কুখ্যাত ইয়াজিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় ইমাম হোসাইন শহীদ হন। নিষ্ঠুর-পাপিষ্ঠ সীমার ঘাড়ের উপর তরবারির আঘাত এনে পবিত্র দেহ থেকে তাওহীদের বাণী উচ্চারণরত উন্নত শির বিচ্ছিন্ন করে। দুরাচারি দুর্বৃত্তরা হযরত ইমাম হোসাইনের "চির উন্নত শির" বর্শাতে গেঁথে প্রথমে কুফায় কুলাঙ্গার ইবনে যিয়াদ সমীপে নিয়ে যায়। সেখানে পবিত্র শির একটি তশ্‌তরীতে রেখে যিয়াদের সম্মুখে রাখা হয়। অন্য দিকে হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহের বস্ত্র উন্মোচন করে কুড়িজন অশ্বারোহী মৃত দেহের উপর দিয়ে নির্মমভাবে পুনঃপুনঃ অশ্বচালনা করতে থাকে। খুরের আঘাতে বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্রতম অঙ্গ সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) পবিত্রতম দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয়। অথচ ইমাম হোসাইনের (রা.) এ দেহ কতোবার বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্রতম পৃষ্ঠে (যেখানে মোহরে নবুয়ত ছিল) উঠেছে তার হিসেব নেই। বিশ্বনবি (দ.) তাঁর পবিত্র ওষ্ঠের স্পর্শ দ্বারা যাঁর মুখ চুম্বন করতেন জালিম-কাফিররা স্বর্ণতুল্য সে সুকুমার পবিত্র দেহ লাঞ্ছিত করে অস্থি-মাংস শতখণ্ডে কারবালার উত্তপ্ত বালুকায় ছড়িয়ে দেয়। একমাত্র কিশোর পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন ব্যতীত পরিবারের সকল পুরুষই শহীদ হন। হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) পবিত্র মস্তক দামেস্কে আমীর মুয়াবিয়ার উত্তরাধিকারী পুত্র দুর্বৃত্ত ইয়াজিদের সম্মুখে নেয়া হয়। হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) প্রতি যে অন্যায়-জুলুম ইয়াজিদ বাহিনী সম্পন্ন করেছে এ সম্পর্ক প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন উল্লেখ করেন, "সেই দুরবর্তী যুগে ও আবহাওয়ায় হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের অন্তরেও সমবেদনা সৃষ্টি করবে।" কারবালার হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ণনায় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, " মোহররমের চাঁদ এল ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।.... কাঁদিয়া জয়নাল আবেদীন বেহুঁশ হ'ল কারবালায়।.........কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি, গাহে তারি মর্সিয়া। ঝরে হাজার বছর ধ'রে অশ্রু তারি শোকে হায়।" কারবালার নৃশংস দৃশ্যে এবং তাণ্ডবলীলায় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গবেষক, অনাত্মীয় কবি, যে কোন সাধারণ মানুষ এখনো অন্তঃজ্বালায় চরম

বিষাদগ্রস্ত, অনুভব করে হাহাকার, অনেকে দিশেহারা হয়ে হায়! হায় হাসান হায় হোসাইন মাতমে আকাশভেদী আওয়াজ তোলে। এটি আহলে বাইতের প্রতি প্রেম-উন্মাদনার প্রতীকী প্রতিবাদ মাত্র।

হাজার বছর পরেও যেখানে অনাত্মীয়দের শোক র‍্যালীতে প্রতিবাদের ভাষায় বিলাপ ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, ঘটনাকালীন সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী কিশোর ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.), পরিবারের সকল মহিলা সদস্যের মানসিক অবস্থা তখন কিরূপ ছিল তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। তাঁদের হৃদয় পিঞ্জর তখন ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ইয়াজিদের দুর্বৃত্তরা শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে মহিলাদের মূল্যবান চাদর ও অলংকার লুণ্ঠন করতে থাকে। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ সকল মহিলাদের শিবিরের বাইরে এনে বন্দী ঘোষণা করা হয়। পৃথিবীর যুদ্ধ ইতিহাসে এ নির্মমতা ও বর্বরতার কোন নজীর নেই। এ রকম বেদনাঘন বিষাদময় পরিস্থিতিতে হযরত যয়নুল আবেদীন বেলায়তের শীর্ষ মোকামে সমাসীন হয়ে ত্বরিকতের দায়িত্ব নেন।

যুদ্ধবন্দী কিশোর ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ সকল বন্দিনীকে নিয়ে দুর্বৃত্ত শয়তান সিমার কুফায় রওনা দেয়। তার অনুচর খুলী বিন ইয়াজিদ হযরত ইমাম হোসাইনের ছিন্ন শির বর্শাগ্রে উত্তোলন করে সর্বাগ্রে চলতে থাকে। তাদের পিছনে হাওদা কূন্য উটের নগ্ন পিঠে চড়ানো হয় অসুস্থ কিশোর যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ মহিলাদেরকে। গ্রীষ্মের পাথর ফাটা উত্তপ্ত রোদ তাঁদের মাথায় পড়তে থাকে। কুফায় বাজার অতিক্রমকালে সহস্র লোক ইয়াযীদের ফৌজী তামাশা দেখার জন্যে রাস্তার দু'ধারে জমায়েত হয়। বিশ্বনবি (দ.)'র আহলে বাইতের প্রতি নির্মমতা দেখে অনেকের হৃদয় ভেঙ্গে গেলেও উমাইয়াদের নৃশংসতার ভয়ে কান্নাকাটি করার সাহসও হারিয়ে ফেলে। কাফেলা কুফায় পৌঁছলে একটি রৌপ্য তশ্‌তরীতে হযরত হোসাইন (রা.)'র "চির উন্নত পবিত্র শির" স্থাপন করে ইবনে যিয়াদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কর্তৃক বার বার নবি হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আ.) কথা বলার কারণ হচ্ছে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.)'র ঘটনার সঙ্গে কারবালার নির্মমতার সঙ্গতির বিষয়টি নবিজী দৌহিত্রকে কুফায় আগমনের পথে তাড়িত করেছে। তাই তিনি বনি ইসরাইলের নগ্ন উৎপীড়কের ভূমিকাকে মুসলিম উম্মাহ্‌র জাগৃতির লক্ষ্যে বার বার স্মরণে এনেছেন। অর্থাৎ তিনি কারবালায় হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (আ.) পরিণতি ভোগ করতে যাচ্ছেন এবং মুসলিম উম্মাহ্‌ বনি ইসরাইলের মতো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

অসীম সাহসী এবং প্রতিবাদী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

জল্লাদ ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে বন্দি কিশোর ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.): কারবালা ময়দানে শাহাদাত প্রাপ্ত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর কর্তিত শির ইবনে যিয়াদের সম্মুখে নীত হলে যিয়াদ কিছুক্ষণ ধরে যুদ্ধজয়ের উল্লাস এবং আনন্দে আস্ফালন করতে থাকে। সে ছুরি দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) মুখে এবং দাঁতে আঘাত করতে থাকে। এ সময় কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত যায়েদ (রা.) নামে একজন সাহাবী এ ধরনের বেয়াদবী সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করে বলেন, "এমন বেয়াদবী আমরা সহ্য করতে পারব না। আমি ঐ দন্তের উপর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)-কে চুমো দিতে দেখেছি।" এতে যিয়াদ ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত যায়েদ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। অবশেষে হযরত যায়েদকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়।

ইতোমধ্যে ইবনে যিয়াদ ইমাম পরিবারের অত্যন্ত সম্মানিতা মহিয়সী মহিলা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র বোন হযরত যয়নবকে তিরস্কার এবং ঘৃণ্য শব্দ দিয়ে বিদ্রূপ করতে শুরু করে। হযরত যয়নব (রা.) যিয়াদের দম্ভোক্তির জবাব দেন শালীন ও সম্ভ্রমপূর্ণভাবে। এতে দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাকাটাকাটি হয়। এর মধ্যে যিয়াদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বালক হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র উপর। সে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি? হযরত যয়নুল (রা.) জবাব দেন, আলী ইবনে হোসাইন (রা.)। দুরাচারী যিয়াদ পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চায়, আশ্চর্যের বিষয়! এখনো তুমি বেঁচে আছ? তোমাকে কি এখনো হত্যা করা হয়নি? যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "আমার আরেক ভাইয়ের নামও আলী। তিনি যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।" কিশোর ইমামের জবাব শুনে ইবনে যিয়াদ মুখ খিস্তি করে বলে ওঠে, "শহীদ হয়নি, আল্লাহ্ নিপাত করেছেন।" পাপিষ্ঠ যিয়াদের উষ্মার প্রতি ভ্রুক্ষেপ

না করে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) বলে ওঠেন, "জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিষয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং অভিপ্রায় ব্যতীত কেউই মৃত্যুবরণ করতে পারে না"– (সূরা আলে ইমরান, আয়াতাংশ : ১৪৫)। বালক ইমাম যয়নুল আবেদীনের কণ্ঠে এ ধরনের বাক্য শুনে জালিম ইবনে যিয়াদ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠে, "দেখ! আল্লাহ্ তোমাকে এক্ষণি মৃত্যুদান করেন কিনা!"

কথোপকথনের এই পর্যায়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা ইবনে যিয়াদ সত্যি সত্যি অসুস্থ, নির্দোষ, মাসুম বালক ইমাম যয়নুল আবেদীন কে (রা.) নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে হত্যার জন্যে অগ্রসর হয়। রক্তলোলুপ ইবনে যিয়াদের ভয়ঙ্কর আচরণ দেখে হযরত যয়নব (রা.) ক্রুদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, "খবরদার পাপিষ্ঠ নরাধম! এই বালকের গায়ে হাত তোলার পূর্বে আমাকে হত্যা করো। তোমরা খাতামান্নবী, আখেরী নবি (দ.) এর পবিত্রতম শোণিত ধারা পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছ। যদি সামান্যতম ঈমানের স্পর্শ তোমার মধ্যে থেকে থাকে, তবে এখনই জঘন্যতম কাজ থেকে বিরত হও।"

হযরত যয়নবের ভর্ৎসনায় মহা পাপাচারী ইবনে যিয়াদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্যত তরবারি অবনমিত করে কয়েক পা পিছনে হটে যায়। পিতার নিকট থেকে আখেরি নবির (দ.) গুপ্ত জ্ঞান ভাণ্ডার বেলায়তপ্রাপ্ত হয়ে বালক যয়নুল আবেদীন (রা.) আল্লাহ্‌র কুদরতি শক্তিতে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ইবনে যিয়াদের আস্ফালন মোকাবিলা করেন। তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, "হে ইবনে যিয়াদ! যদি ঈমানের সামান্য অংশও তোমার মধ্যে থেকে থাকে, তবে আমার মৃত্যুর পর নবির (দ.) ঘরের এসব মর্যাদাবান মহিলাদেরকে কোন খোদাভীরু মোত্তাকী লোকের হেফাজতে মদিনায় পাঠিয়ে দিও।"

দামেস্কের পথে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

ইবনে যিয়াদের জিন্দান খানায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ মহিলাদেরকে বন্দী হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে,-এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুফার চারিদিকে ক্ষোভ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে বিক্ষোভ শুরু করে। গণ বিষ্ফোরণের আশঙ্কা দেখে ভীত হয়ে ইবনে যিয়াদ দুর্বৃত্ত সিমার ও মাযহাব বিন সালাবার নেতৃত্বে হযরত ইমাম হোসাইনের কর্তিত পবিত্র শির, বন্দী যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং মহিলা বন্দিদের সহ দামেস্কে দুরাত্মা ইয়াজিদের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

অসুস্থতা, পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদের শাহাদাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, মানসিক নির্যাতনে বিষন্ন ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ নবি (দ.) বংশের মাননীয়া সকল মহিলা সদস্যকে হাওদা বিহীন উটের পিঠে বসিয়েই দুষ্ট দাম্ভিক সিমারের নেতৃত্বে উত্তপ্ত মরুভূমির পথে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটি গভীর শোকে মূহ্যমান নবি (দ.) পরিবারের উপর জালিম শাসকের মানসিক নির্যাতন। রোগ শয্যার কারণে রুগ্ন এবং পীড়ায় দুর্বল ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) দুঃশাসকের দুর্বিনীত এ ধরনের হাইওয়ানী আচরণেও কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখান নি। মহাপাপী সিমারের নিকট উষ্ট্রপৃষ্ঠে একটা হাওদা বা ছায়ার ব্যবস্থা অথবা অনুরূপ সামান্য কোন সুযোগ সুবিধাও তিনি চাননি। পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদের বিয়োগ ব্যথায় বিমর্ষ হয়েও তাঁর মধ্যে আবেগোদ্দীপ্ত-হতশ্রদ্ধ আচরণের কোন লক্ষণ নেই। মহান আল্লাহ্‌র মর্জি এবং সন্তুষ্টির উপর নিজেকে সোপর্দ করে ভগ্ন হৃদয়া মহিলাদের নিয়ে তপ্ত রোদে জ্বলে পুড়ে জীবন সংগ্রামের কঠিন যাত্রাপথে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন।

ইয়াজিদের রাজসিক বৈঠকখানায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

গ্রীষ্মের খররোদ, উত্তপ্ত লু-হাওয়া সহ্য করে ধুলি-ধুসরিত দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে অবশেষে বর্শা শীর্ষে হযরত হোসাইন (রা.) এর পবিত্র মস্তক সহ বন্দী বালক যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং বন্দিনী নবি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কসাই সিমার ইয়াজিদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সমগ্র পরিস্থিতি অবলোকন করে ইয়াজিদ সিমারকে ভর্ৎসনার ভণিতা করে। তবে ইয়াজিদ বন্দীনীদের সঙ্গে শান্ত এবং ভদ্র আচরণ করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে অন্তঃপুরে চলে যায়। অন্তঃপুরে অবস্থানরত মহিলারা সমস্ত ঘটনা শুনে এবং পর্যবেক্ষণ করে মাতম জুড়ে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ইয়াজিদ পুনরায় তার রাজ দহলিজে আগমন করে কিছুটা মৌখিক সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে বলে উঠে; “আলী ইবনে হোসাইন! তোমার পিতাই আমার সঙ্গে সম্পর্ক কর্তন করেছেন। তিনি আমার অধিকারের কথা ভুলে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তোমরা তা দেখেছ।”

এটি মূলতঃ ইয়াজিদের ক্ষমতার দর্পকে সংযত ভাষায় প্রকাশ করার নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ ইয়াজিদের পিতা তাকে রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন প্রবীণ সাহাবাদের সম্মতি সাপেক্ষে নয়। হুমকি-ধমকি প্রদর্শনের মাধ্যমে। আমীর মুয়াবিয়া হযরত হাসান (রা.) এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে ক্ষমতা এবং কোথাও কোথাও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ইয়াজিদের মতো মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত অযোগ্য-অপদার্থকে মুসলিম জাহানের শাসক হিসেবে চেপে দিয়েছেন। ইয়াজিদ এ বিষয়টিকে ‘অধিকার’ বলে বৈধ

করতে চেয়েছে। ইয়াজিদের মুখে স্বীয় মহামহিম পবিত্র পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কে 'শক্তি প্রয়োগে অগ্রসর' হবার অপবাদ প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে নীরবে বসে থাকা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মুখ খোলেন। জালিম এবং অত্যাচারী শাসকের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অনেক কঠিন আযাব সম্পর্কিত "আয়াতে করীমা" থাকা সত্ত্বেও ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ইয়াজিদ সম্মুখে তুলনামূলকভাবে খুবই সংযত প্রকৃতির আয়াত উচ্চারণের মাধ্যমে ইয়াজিদের বক্তব্যের জবাব দেন। পবিত্র কোরআনের আয়াত পাঠ করে তিনি বলেন, "তোমাদের উপর যা কিছু আপতিত হয়, সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে নিতান্ত সহজ; এই জন্যে যে, তোমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আক্ষেপ না কর। আর অপর দিকে সাময়িক সাফল্য লাভ করে আত্মাভিমানী হয়ে না যাও। আল্লাহ্ অহঙ্কারী ও দাম্ভিক দিগকে পছন্দ করেন না" −(সূরা হাদীদঃ ২২-২৩)। উপর্যুক্ত আয়াতে করীমায় হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নিজের অবস্থা এবং ইয়াজিদের যুদ্ধজয় সম্পর্কিত আত্মতুষ্টির বিষয়কে অত্যন্ত দুরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করে ইয়াজিদকে স্তম্ভিত করে দেন।

বালক ইমাম যয়নুল আবেদীনের সুস্পষ্ট জবাব ইয়াজিদের পছন্দ হয়নি। তবে এ ব্যাপারে কথা কাটাকাটি করাকে ইয়াজিদ সমীচীন মনে করেনি। এসময় জবাব দেয়ার জন্যে ইয়াজিদ ইমামের সমবয়স্ক নিজ পুত্রের দিকে তাকালেও শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ বেলায়তের আলোতে দীপ্ত, ঐশী তজল্লিতে প্রাজ্ঞ হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) জ্ঞানভাণ্ডার মোকাবিলা করার মতো শিক্ষা এবং বিদ্যা শুধু ইয়াজিদ পুত্রের নয়; বরং তার সভাসদদের মধ্যেও কারো ছিল বলে ধারণা করা যায় না।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর যুক্তি খণ্ডনে ব্যর্থ হয়ে দুঃশাসক ইয়াজিদ তখন তার পুত্রের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে লড়তে ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) প্রতি আহ্বান জানায়। ইয়াজিদ অসুস্থ এবং রুগ্ন ইমামকে প্রস্তাব দেয় যে, "তোমারই সমবয়সী আমার পুত্রের সঙ্গে একবার মল্ল লড়াই করে শক্তির বাহাদুরী প্রমাণ করো। যদি তুমি জয়লাভে সমর্থ হও, মনে করব তোমাদের দাম্ভিকতার সত্যতা রয়েছে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর পিতার সম্মুখে মস্তক অবনত করে তার আনুগত্য স্বীকার করতে আশা করি অবশ্যই বাধ্য থাকবে।"

ইয়াজিদের এধরনের প্রস্তাবের মূলে ছিল তার পুত্র খুবই স্বাস্থ্যবান ও বলশালী। ইয়াজিদ মনে করেছিল তার পুত্রের বলদর্পের সম্মুখে রুগ্ন ইমাম যয়নুল আবেদীন সহজে কুপোকাত হয়ে যাবেন। ইয়াজিদের এ ধরনের প্রস্তাবে অসুস্থ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে উল্লেখ করেন, "শুধু দৈহিক শক্তির কেন? অস্ত্র চালাবার পরীক্ষাও হয়ে যাক। একখানা তরবারী তোমার পুত্রের হাতে দাও; আর একখানা আমাকে দাও। সত্যের অনুসারী নির্ভীক ন্যায়বাদীর সাথে মিথ্যা ও অন্যায় আশ্রয়ী ভীরু কাপুরুষদের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাক।" ইমামের বিকল্প প্রস্তাব শুনে ইয়াজিদ ভড়কে যায় এবং ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, "হোসাইন তনয়! বুঝেছি তুমি সত্যিই বীরপুরুষের বীর সন্তান বটে। তাই বীরের ধর্ম রক্ষা করতে তুমি পরাঙ্মূক্ত নও। কিন্তু এসময় এ পরিস্থিতিতে তোমার দ্বারা মল্লযুদ্ধ করানো আমার ইচ্ছে নয়। তোমাকে শুধু পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আমি ঐ কথা বলেছিলাম।" ইয়াজিদের এ ধরনের প্রস্তাব ও কথাবার্তায় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো– ইয়াজিদ জ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি এবং হিকমতের ব্যক্তি নয়, সে শক্তি ও বলদর্পে বিশ্বাসী।

বিভিন্ন কথাবার্তার ফাঁকে ইয়াজিদ ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) কোন বাসনা আছে কিনা জানতে চায়। কথোপকথনের এক পর্যায়ে ইমাম বলেন, "আগামীকাল শুক্রবার। জুমআর নামাযে আমি খুত্‌বা পাঠের অনুমতি চাচ্ছি। ইয়াজিদ ইমামকে জানায়, "তোমার বাসনা আমি পূর্ণ করব।" পরদিন শুক্রবার। দামেস্ক মসজিদ মুসল্লিতে ভরপুর। মুসল্লিরা আগেই সংবাদ পান যে, আজ সৈয়্যদুশ্ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইনের জীবিত একমাত্র বালকপুত্র খুত্‌বা দিবেন। যথাসময়ে ইমাম মসজিদে প্রবেশ করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষায়, গুরু গাম্ভীর্যে, তেজোদীপ্ত কণ্ঠে খুত্‌বা পাঠ শুরু করেন। সর্বত্র প্রচণ্ড নীরবতা; শুধু একটি কণ্ঠই সরব। এ কণ্ঠ নবি বংশের উত্তরাধিকারের। সর্বপ্রথম তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের গুণ ও প্রশংসা করেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন। এরপর তিনি বিশ্বনবি (দ.) এর নাত ও সিফাত বর্ণনা শেষে স্বীয় মাতৃকুলের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন নবি বংশের চেরাগ। তাঁর চেহারায় নূর নবির (দ.) জ্যোতির বিকাশ দেখে মুসল্লিরা চমকিত হয়ে পড়ে। মুসল্লিদের মধ্যে ঈমানী আবেগ এবং নবির (দ.) প্রতি পরম আনুগত্য ও ভালবাসা প্রকাশ পাচ্ছিল।

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা খুত্‌বায় তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের গুণ কীর্তন করে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সার্বিক বর্ণনা প্রদান করেন। খুত্‌বায় তিনি কারবালা প্রান্তরে ইমাম শিবিরের জন্যে পানি সরবরাহ বন্ধ, শিশু-কিশোর-যুবক হত্যার এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর উপর নারকীয়

হত্যাযজ্ঞ ও মস্তক বিচ্ছিন্ন শবদেহের উপর হাইওয়ানী আচরণ, নবি (দ.) এর পরিবারের পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলাদের প্রতি বিরূপ ব্যবহার, শিবির লুণ্ঠন সবকিছুর বর্ণনা দেন। এতে মসজিদে সমবেত মুসল্লিদের মধ্যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য, ভাবান্তর ও কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। মসজিদ জুড়ে উচ্চকণ্ঠে কান্নার রোল চলছিল, অনেকে প্রকাশ্যে দীপ্ত কণ্ঠে কারবালা প্রান্তরের হত্যাকাণ্ড সংঘটকদের অভিসম্পাত দিতে থাকেন। এ ধরনের পরম আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজা ইয়াজিদ নামায সম্পন্নের জন্যে মসজিদে প্রবেশ করে। প্রথম কাতারে উপস্থিত হয়ে সে চুপচাপ বসে পড়ে। ইয়াজিদ ধারণা করেছিল, খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পর ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার সিফতও উল্লেখ করবেন এবং প্রকারান্তরে ইয়াজিদের শাসনকে স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সেদিকে মোটেও যাননি। অথচ ইমামের বক্তব্যের প্রভাবে মুসল্লিদের মধ্যে নবি প্রেমের প্রাবল্য এবং উত্তেজনার ভাব স্পষ্টতর হচ্ছে। মসজিদের অভ্যন্তরে মুসল্লিদের ভাবান্তর দেখে ইয়াজিদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে লক্ষ্য করে এ বালকের খুত্‌বা শুনে মানুষজন যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছে, তা যদি দামেস্কের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তবে খোদ রাজধানীতে ব্যাপক হট্টগোল সৃষ্টি হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে বেগতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ইয়াজিদ মুয়াজ্জিনকে একামত বলার নির্দেশ দেয়।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজানের ধ্বনি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) খুত্‌বা বন্ধ করে দেন। মুয়াজ্জিন বলেন, আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! মিম্বরে বসেই ইমাম যয়নুল আবেদীন জবাব দেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্য কোন শক্তিই তাঁর সমকক্ষ নয়। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্! ইমাম জবাব দেন, আমার মন প্রাণ, অস্থি-মজ্জা এবং সমগ্র সত্তার তরফ থেকেও একই সাক্ষ্য উচ্চারিত হচ্ছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ বা মাবুদ নেই। মুয়াজ্জিন প্রবল আবেগঘন কণ্ঠে বলে উঠলেন, – আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্! এবার ইমাম যয়নুল আবেদীন ইয়াজিদকে লক্ষ্য করে বলে উঠেন– ইয়াজিদ বলো, মসজিদের মিনার থেকে যাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হলো তিনি কি তোমার নানা ছিলেন, না আমার পিতার? দু'হাত প্রসারিত করে তিনি বলেন, এই ধমনীতে যে মহাপুরুষের পবিত্রতম রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তা কি তোমার ধমনীতে হচ্ছে! যদি বল, তিনি তোমার নানা ছিলেন, তবে তা হবে জঘন্য মিথ্যাচার। সুতরাং ভেবে দেখ, তুমি কার সন্তানগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছ? মসজিদ জুড়ে মুসল্লিদের আবেগের প্রবল বন্যা এবং কান্না দেখে ইয়াজিদ খুবই শংকিত হয়ে পড়ে। হতভম্ব ইয়াজিদ তেজস্বী বালক ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বরের

মোকাবিলা করতে পারেনি। বালকের পরম সাহসিকতা লক্ষ্য করে শুধু কতোক্ষণ তাঁর পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যয়নুল আবেদীন (রা.) এর বক্তব্য এবং অসীম সাহস দেখে মুসল্লিরা শিউরে উঠেন। কারণ ইয়াজিদ আবার কী দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে! কিন্তু জনগণের আবেগ ও ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে এ ধরনের ভর্ৎসনা নীরবে হজম করে নেয়।

আজান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন মিম্বর থেকে নেমে আসেন। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে তিনি নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে যান। দামেস্ক মসজিদের এ ঘটনা ইয়াজিদকে নতুন ভাবনায় ফেলে দেয়। কোন্ পন্থায় এই তেজী বালককে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে পরামর্শ করে। কেউ কেউ ইমামকে হত্যা করে ইয়াজিদকে আশঙ্কামুক্ত হবার পরামর্শ দেয়। আরব জাহানের সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষত মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ, বসরা, কুফা এমনকি সিরিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে অদমনীয় উত্তেজনা সৃষ্টির ভয়ে শংকিত ইয়াজিদ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে যতশীঘ্র সম্ভব ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সহ পরিবারের সকল সদস্যকে দামেস্ক থেকে সসম্মানে মদিনা শরিফে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অষ্টম অধ্যায়

মদিনার পথে পবিত্র রওজা আকদসে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

কারবালার লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পর ইমাম পরিবারের মহিলা ও শিশুগণ কুফার সাবেক গভর্নর বয়োবৃদ্ধ সাহাবা নোমান বিন বশীরের তত্ত্বাবধানে ইয়াজিদের নির্দেশে মদিনা শরিফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কারবালার রক্তাক্ত প্রান্তরে সংঘটিত বীভৎস হত্যাকাণ্ড, শহীদ হোসাইন (রা.) এর পবিত্র নিথর দেহের উপর যে ধরনের বর্বরতা চলেছে তাতে মানবতা এবং মানব মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। অথচ পৃথিবীতে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নানা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রেরিত হয়েছেন মানবজাতিকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান শিক্ষা দানের জন্য। বিশ্বনবি (দ.) সমগ্র জীবন মানবজাতির মানবিক গুণাবলী অর্জনের যে নবদিগন্তের উদ্বোধন করেছেন তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্রের শাহাদাত এবং তাঁর পবিত্র লাশের উপর যে ধরনের নগ্ন-অসভ্য আচরণ করা হয়েছে সেখানে মূলতঃ বিশ্বনবি (দ.) এর শিক্ষাকেই পদদলিত করা হয়েছে। বিশ্বনবি (দ.) বিশ্ব মানবতার জন্যে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। কারবালা প্রান্তরে ইসলাম ধর্মের এক শ্রেণির কথিত অনুসারী সেই সভ্যতাকেই সহিংস বর্বরতায় নিমজ্জিত করে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। অথচ যুদ্ধনীতি সম্পর্কে আল-কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিল, এটি ছিল অমীমাংসিত যুদ্ধ। এযুদ্ধে মুসলিমদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন সর্বোচ্চ পঁয়ষট্টিজন। কুরাইশ রমণীরা শহীদদের শবদেহের উপর বীভৎস অনাচারে লিপ্ত হয়েছিল। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার (আমীর মুয়াবিয়ার মাতা) নির্দেশে বিশ্বনবি (দ.) এর চাচা, অমিততেজ সাহসী বীর হযরত আমীর হামযা (রা.) এর বুক চিরে কলিজা বের করে হত্যাকারী ওয়াহ্শি। পরে ওয়াহ্শি কলিজাটি হিন্দাকে প্রদান করে। হিন্দা তার

প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কলিজা থেকে এক টুকরো দাঁত দিয়ে কেটে চর্বণ করে ভক্ষণ করেছিল। এ সময় ওয়াহ্শি বদর যুদ্ধে হিন্দার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হযরত আমীর হামযা (রা.)-কে শহীদ করার পুরস্কার চাইলে হিন্দা তার গলার সোনার হার খুলে ওয়াহ্শিকে দিয়ে দেয়। হিন্দার প্রতিশোধ পরায়ণতা এতো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল যে, সে নিজ হাতে হযরত আমীর হামযার (রা.) নাসিকা ও কর্ণ কর্তন করে। সে তার সঙ্গী মহিলাদেরকে অন্যান্য শহীদদের নাক ও কর্ণ কর্তন করে চেহারা বিকৃতির নির্দেশ দেয়। হযরত আমীর হামযার (রা.) শবদেহকে বিকৃত ও লাঞ্ছিত, অপমান করার ব্যাপারে আবু সুফিয়ানও অংশ নেয়। সে তার তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে শহীদ হামযার ওষ্ঠে আঘাত করতে করতে বলে, "আমাদের ত্যাগ করার ফল ভোগ কর।"

যুদ্ধ শেষে রাসুলে খোদা (দ.) হারিছ ইবনে আস্ সিম্মাহ (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আমীর হামযার লাশ খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাঁরা হযরত হামযার (রা.) পবিত্র লাশ দেখে বিচলিত ও হতভম্ব হয়ে যান। রাসুলে খোদা (দ.)-কে এ খবর দিলে তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন, "আমি এর প্রতিশোধ নেব। যদি এর পরের বারের যুদ্ধে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে কুরাইশদের ওপর বিজয়ী করেন তাহলে আমরা আমাদের একজনের বদলে তাদের ত্রিশটি মৃতদেহ বিকৃত করব।" বিশ্বনবি (দ.)'র এই ধরনের ক্রুদ্ধ ঘোষণায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী আসে, "যদি শত্রুর আঘাতকে প্রতিঘাত করতে হয় তবে শত্রু আপনাকে যতটা আঘাত করেছে, আপনিও তাদের ততটাই আঘাত করবেন। কিন্তু আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন তাহলে সেটাই আপনার জন্যে ভাল– কেননা যারা ধৈর্যধারণ করেন আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন– (সূরা ন'মল : ১২৬)। এ ওহী নাযিল হবার পর রাসুলে খোদা (দ.) তাঁর প্রতিশোধের ইচ্ছা প্রত্যাহার করেন এবং মুসলমানদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন, "তারা যেন কোন মৃত দেহের অসম্মান না করেন।" তাছাড়া যুদ্ধের সময় কোন মানুষের চেহারায় আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেন এবং বলেন, "আল্লাহ্ আদমকে তাঁর নিজের আকৃতিতে নির্মাণ করেছেন। তাই মানুষের মুখাবয়বে আঘাত করবে না।" যুদ্ধক্ষেত্রের মতো হিংসা-প্রতিহিংসা, উত্তেজনা ও হত্যাযজ্ঞের বীভৎস নির্মম পরিবেশেও মানবজাতিকে সংযত হবার জন্যে এটিই হচ্ছে পবিত্র কোরআন ঘোষিত সভ্যতার নির্দেশনা। তাই মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামের চরম শত্রু কুরাইশ নেতাদের হাতের নাগালে পেয়েও বিশ্বনবি (দ.) কোন প্রকার প্রতিশোধ নেননি, বরং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মানব সভ্যতা বিকাশের এবং মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার নব দিগন্তের সূচনা করেন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য যে, বিশ্বনবি (দ.)–এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র এবং তাঁর পবিত্রতম শোণিতধারার উত্তরাধিকারীরা একশ্রেণির মুসলিম নামধারী নরপিশাচ হতে

সামান্যতম মানবিক আচরণ প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ধরনের বর্বরতার প্রকাশ্য নায়ক হলো হিন্দার পৌত্র ইয়াজিদ।

নৃশংসতা, বর্বরতা, অপমান-অসম্মান, সব ধরনের অকল্পনীয় নির্মমতা অবলোকন করার পরেও হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ঈমানী তেজ, সাহস, বীরত্ব এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা হারাননি। এ ধরনের বিপর্যয় ও অন্তহীন-অসহনীয় বেদনায় যে কোন মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা, জিঘাংসাপরায়ণ ও হিতাহিত জ্ঞানকূন্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র অশেষ মহিমায় হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের মধ্যে তাঁর সামান্যতমও প্রতিফলিত হয়নি। মাত্র সতের/আঠার বছর বয়সের একজন বালক এ ধরনের বিপদ-বেদনা হৃদয়ঙ্গম করে প্রতিপক্ষের সকল প্রকার দুর্ব্যবহারেও পরম সংযমের পরিচয় দিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পবিত্র মদিনার দিকে অগ্রসর হন। পুণ্যাত্মা শহীদান কারবালার মরুপ্রান্তরে বালুকার সমাধিতে অনন্ত নিদ্রায় রয়েছেন। তাঁদের পবিত্র দেহ ধারণ করে রক্তাক্ত কারবালাও পবিত্রতা অর্জন করেছে। ইসলাম ধর্ম এবং তাওহীদের মর্মবাণীর একনিষ্ঠ রক্ষক হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ধ্বংস করে দাম্ভিক ইয়াজিদ তার দানবীয় অহঙ্কার সার্থক করেছে। এখন সে নিরুদ্বেগে পরম স্বস্তির সাথে সূরার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে। সূরার অপরিহার্য উপচার নারী ও নৃত্য তার বিলাস কক্ষ আমোদিত করছে। তার অপাচার ও অপকর্মের প্রতিবাদী কোন ব্যক্তি ও ভাষা আর নেই। শাণিত তরবারি দিয়ে সব কিছুই স্তব্ধ করে রেখেছে। এ সময়ে বিষাদক্লিষ্ট ইমাম হোসাইন (রা.)-এর অসহায় পরিবার একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র অনুপম রহমতে পাষাণদ্রাবী শোকানল হৃদয়ে চেপে দামেস্ক হতে রওজা আকদসের ছায়া প্রাপ্তির প্রত্যয় নিয়ে মদিনার পথে এগুতে থাকেন।

দামেস্ক থেকে মদিনা আটশ মাইলের দীর্ঘ মরুপথ। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে খেজুর বৃক্ষ এবং পানির প্রস্রবণ ভিন্ন অন্য কিছু চোখে পড়ে না। এ দৃশ্য শোকানলে দগ্ধ যাত্রীদের মনে হয়তো কারবালার দৃশ্যপট জাগিয়ে তুলছে। এক বিন্দু পানির অভাবে সেখানে স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃক্রোড়ে জীবন লীলা সংবরণ করেছে। সিংহবিক্রম হযরত ইমাম হাসান (রা.) পুত্র কাসেম, আলী আওসাদ, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) পুত্র অমিততেজা সাহসী আলী আকবরসহ অনেকে পিপাসায় কাতর হয়ে শুষ্ক কণ্ঠে ফেরাউনী নফ্‌স বর্বরদের হস্তে শহীদ হয়েছেন– তাঁদের তখন চাহিদা ছিল এক গ্লাস পানি। সর্বোপরি সর্বশ্রদ্ধেয় মহামান্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) কারবালা পরবর্তী ইসলাম ধর্মের শাশ্বত প্রতীক, তৃষ্ণা কাতর অবস্থায় নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন।

রওজা আকদসে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

দামেস্ক থেকে মদিনা যাত্রীদের ক্ষুদ্র কাফেলার মর্মভেদী হাহাকার শুধু ইমাম পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং আরবের সর্বত্র এই মর্মান্তিক তাণ্ডবলীলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আরবের সর্বত্রই অশ্রুবন্যা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়। এর মধ্যেই দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর নেতৃত্বে আহলে রাসুল (দ.) গণ মদিনা মনোয়ারায় প্রবেশ করেন। কাফেলা দৃশ্যমান হবার সঙ্গে সঙ্গে মদিনার সমস্ত নাগরিক নতুন করে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু করে। শোকের মাতমে মদিনার অলি-গলি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। মদিনাবাসী অবিলম্বে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ইবনে যিয়াদ, ওমরু, সিমার, মাযহার বিন সালবাসহ সকল দুর্বৃত্তের মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। মদিনার পবিত্র নগরীর চরম উত্তেজনাপূর্ণ সময়েও হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে সর্বপ্রথম বিশ্বনবি (দ.)-এর রওজা পাকে উপস্থিত হন। কারবালার প্রান্তরে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মর্মান্তিক শাহাদাত প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র মৃত্যুভয় আর অবশিষ্ট নেই। তিনিই ইমাম পরিবারের একমাত্র অভিভাবক। বিদেশ বিভূঁইয়ে স্বজনহীন অবস্থায় মর্মান্তিক দুঃখ বেদনা ভোগ করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত পুত্র যেমন মাতৃক্রোড়ে প্রশান্তির অবসাদ খুঁজে, তেমনি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)ও বিশ্বনবির (দ.) রওজা শরিফে পবিত্রতম কদমের পরশে সান্তনার শীতল স্পর্শ পাবার জন্যে বিনম্রভাবে হাজির হন। অশ্রু ভারাক্রান্ত করুণ কণ্ঠে তিনি বিশ্বনবি (দ.)'র প্রতি সালাম নিবেদন করে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয় ভগ্নহৃদয়ে, বিধ্বস্ত কায়া নিয়ে একজন দূত হিসেবে তিনি তাঁর মান্যবর পিতা, রাসুলে খোদা (দ.)'র প্রিয়তম দৌহিত্রের মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদ জানাচ্ছেন।

সালাম নিবেদনের পর তিনি মসজিদে নববিতে দু'রাকাত নামায আদায় করে সর্বশোকতাপ হরণকারী মহান প্রতিপালক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র একক অধিশ্বর আল্লাহ্‌র দরবারে দুহাত প্রসারিত করে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, "হে মহান রব! হে পরওয়ারদিগার! তুমিই আমাকে অপার রহমতের দ্বারা ধন্য করেছ। আমার উপর অবিরাম অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করেছ। মহা সংকটের পর আজকের এই স্বস্তির মুহূর্তেও আজ আমি তোমাকেই ডাকছি। তুমিই সর্বাবস্থায় আমার একমাত্র প্রিয়তম সহায়। দুনিয়ার কারো প্রতি আমার আর কোন ভয় নেই, কোনক্রমেই আমি আর সন্ত্রস্ত নই।

হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মরণাপন্ন হবার মুহূর্তে মানুষ যেভাবে তোমাকে ডাকে, সকল দরজা থেকে নিরাশ হবার পর যেভাবে তোমারই

আশ্রয় ভিক্ষা করে মানুষ নতুন করে বাঁচতে চায়, ডুবন্ত মানুষ যেভাবে শেষ আশ্রয়ের আশায় তোমারই দিকে হাত বাড়ায়, আমিও সে উদ্বেগ, সেই আকাঙ্ক্ষা সেই ভীতি নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত তুলেছি।

হে আমার প্রিয়তম মাওলা! আমার আজ আর কেউ নেই। আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ বিলীন হয়ে গেছে। একের পর এক সব বিপদের পাহাড় এসে আমার উপর আপতিত হয়েছে যে, আজ আর আমার মধ্যে সে সব সহ্য করার শক্তি অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এখন আমাকে অনুগ্রহ করে উদ্ধার করো। আমি আজ দুনিয়ার সকল কিছু থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছি, একমাত্র তোমার অনুগ্রহের আশা ছাড়া আমার আর কোন আশাই অবশিষ্ট নেই। মাওলা! তোমার অনুগ্রহই তো আমাদের একমাত্র সম্বল। তুমি আমার আকুল ফরিয়াদ মঞ্জুর করো।”

উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) সমীপে

মসজিদে নববি থেকে বের হয়ে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) পার্শ্ববর্তী হুজরা সমূহে অবস্থানরত উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.) সমীপে গমন করেন। প্রথমে তিনি হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর হুজরায় গমন করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) হযরত হোসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি অত্যধিক মহব্বত রাখতেন। বিশ্বনবি (দ.) এর বংশের বিশেষত হযরত ইমাম হোসইন (রা.) এর বংশের “শেষ চেরাগ” হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে তিনি পরম আদরে গ্রহণ করেন। তিনি শোকে মূহ্যমান বালক যয়নুল আবেদীন (রা.) কে পরম মমতায় সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেন। হযরত হোসাইন (রা.) এর কিছু অস্ত্র এবং কিতাব তাঁর নিকট গচ্ছিত ছিল। হযরত সালমা (রা.) এর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এ গুলো বিক্রি করে পিতার যাবতীয় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর খরচ ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি হক্কুল ইবাদে ছিলেন নিতান্ত একনিষ্ঠ। তিনি অসংখ্য এতিম, বেওয়া এবং অসহায় ব্যক্তিকে লালন পালন করতেন। অনেক অসহায় ক্রীতদাসের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে তাঁকে অনেক মোটা ঋণ গ্রহণ করতে হতো। এদিকে ইমাম পরিবারের সামান্য কিছু ভূমি ছাড়া আয়ের অন্যকোন উৎস ছিল না। হযরত হোসাইন (রা.) এর ইউহান্নাছ নামক এক গোলাম একবার সেই ভূমি চাষ করার সময় ভূ-গর্ভ থেকে পানির একটি ঝরণা ফুটে বের হয়েছিল। গোলামের নাম অনুসারেই ঝরণাটির নামকরণ করা হয়েছিল। মরুভূমিতে ঝরণাযুক্ত জমি হওয়ায় এটি খুবই মূল্যবান ছিল। পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ কল্পে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) শেষ পর্যন্ত সেই মূল্যবান জমিটুকুও বিক্রি করে দেন। উমাইয়া বংশের জনৈক আমীর সেটা ক্রয় করেন।

নবম অধ্যায়

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর বিবাহ এবং পবিত্র জীবন ধারা

পিতৃঋণ পরিশোধ এবং পরিবারের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি ঘুচানোর পর ইমাম বংশের মুরুব্বী হযরত যয়নব বিনতে আলীর (রা.) পরামর্শে সকলে একমত হয়ে হযরত ইমাম হাসানের (রা.) কন্যা ফাতেমার সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। শোক বিহ্বল পরিবেশে নবিজীর (দ.) বংশধারাকে সংরক্ষণের জন্যে হযরত যয়নব (রা.) এ ধরনের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিশ্বনবি (দ.) এর অতিপ্রিয় দুই দৌহিত্রের পবিত্র রক্তধারার সংযুক্তি এবং সম্পর্কের মধ্যেই তিনি নিখাদ সৈয়দী বংশের পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করেছিলেন। দুই ইমাম পরিবারে মাতা-পিতা না থাকায় তাঁদের পরিচালনার এবং প্রধান অভিভাবিকার দায়িত্ব হযরত যয়নব (রা.) গ্রহণ করেন। অবশ্য কারবালা প্রান্তরে সশস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধপোশাক পরিহিত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শিবির থেকে বিদায় গ্রহণ কালে পরিবারের দায়িত্ব হযরত যয়নব (রা.) এর উপর অর্পণ করেছিলেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মদিনাবাসীদের প্রস্তাবে অনীহা

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) যখন মদিনা শরিফে প্রবেশ করেন তখন নগরী জুড়ে কারবালার বিয়োগাত্মক ঘটনার বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ চলছিল। সর্বত্রই একটি মাত্র দাবী, অনতিবিলম্বে জনগণ কারবালা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার ও দোষীদের মৃত্যুদণ্ড চায়। পরিস্থিতি এতো ভয়াবহ যে, সর্বত্রই জনরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। তখন ওসমান বিন আবু সুফিয়ান ছিলেন মদিনার গভর্নর। শান্তপ্রকৃতি এবং সদ্ব্যবহারের জন্যে তাঁর প্রভূত সুনাম ছিল। তিনি মদিনার উত্তেজনা ও ইয়াজিদ বিদ্বেষ প্রশমিত করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। তিনি নাগরিকদের মনোকাঙ্ক্ষার প্রতি গভীর সহানুভূতি জানালেন। তাঁরই পরামর্শে কারবালা ঘটনার প্রতিকার চাইতে মদিনার

দশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল ইয়াজিদ সমীপে দামেস্কে গমন করেন। এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মনযর বিন যুবায়ের এবং আব্দুল্লাহ্ বিন হানযালা। প্রতিনিধি দলের দামেস্ক গমনের বিষয়টি মদিনার গভর্নর ওসমান পত্র মারফত পূর্বাহ্নে ইয়াজিদকে অবহিত করেন। ইয়াজিদ প্রতিনিধি দলকে সাদরে গ্রহণ করে। সে প্রতিনিধিদেরকে অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করে সৌজন্য প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রতিনিধি দল অর্থ বা উপঢৌকনের লালায়িত ছিলেন না। তাঁরা এ ধরনের উৎকোচ প্রবণতায় মোটেও নরম হননি। তারা সুস্পষ্টভাবে কারবালা হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করেন। কিন্তু দুষ্ট দাম্ভিক ইয়াজিদ এ বিষয়ে কর্ণপাত করেনি, বরং এ ধরনের দাবী তুলে ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য সে প্রতিনিধি দলকে ধমক দিয়ে বিদায় করে দেয়।

প্রতিনিধি দল দামেস্কে অবস্থানকালে লক্ষ্য করেন যে, ইয়াজিদ প্রকাশ্যে সূরা পান, মৃগয়া, নৃত্যগীতে ডুবে থাকে। ইসলাম ধর্মে বারিত বিষয়ের প্রতি তার আকর্ষণ লক্ষ্য করে প্রতিনিধি দল মর্মাহত হন। রাজা ইয়াজিদের চরিত্র দোষ সমগ্র দামেস্ক শহরকে পাপ ও বিলাসের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দামেস্ক থেকে ফিরে এসে প্রতিনিধি দল জনসম্মুখে দামেস্কের ভয়াবহ চিত্র এবং অপরাধ জগতে ইয়াজিদের হাবুডুবু খাবার বিষয়টি প্রচার করে দেয়। প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে দামেস্কের পরিস্থিতি এবং ইয়াজিদের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা এমন ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছি, ধর্মের সাথে যার আদৌ সম্পর্ক নেই। মদ্যপান, গানবাদ্য, পর্যটন ও শিকারে সে মত্ত। লম্পটদের সংশ্রব ও সাহচর্য তার নিকট প্রিয়। আমরা তার বায়াত প্রত্যাহার করছি। তার প্রদানকৃত অর্থ তার মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ বাবদই ব্যয় করবো।" এতে মদিনার আবাল বৃদ্ধ বণিতা ইয়াজিদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে থাকে। মদিনাবাসী সমবেতভাবে ইয়াজিদের বায়াত প্রত্যাখ্যান করে। তারা আবদুল্লাহ্ বিন হানযালাকে নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। সংগঠিত হয়ে তারা প্রথমেই গভর্নরের প্রাসাদ ঘেরাও করে এবং ওসমানকে বন্দী করে।

আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা ছিলেন আনসার। ফলে সেখানে পুনরায় আনসার-মুহাজির প্রশ্নটি সম্মুখে চলে আসে। কুরাইশ বংশীয় নেতা মন্যর বিন যুবায়ের বংশগত কৌলিন্য এবং আভিজাত্যের বিষয়টি স্মরণ করে প্রকাশ্য সভায় হান্যালাকে ভর্ৎসনা করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোপূর্বে স্থির হয়ে আছে যে কুরাইশ বংশই আরবের নেতৃত্বের অধিকারী। অবশ্য আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা নিজেও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তিনি প্রকাশ্য সভায় নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেন এবং কুরাইশবংশীয় কাকেও দায়িত্ব প্রদানের জন্যে সমাবেশকে অনুরোধ জানান। চরম বিপর্যয়ের সময়ও সিয়াসত ব্যবস্থায় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং কৌলিন্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার

প্রশ্নটি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নিকট চরম বিব্রতকর এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলিম উম্মাহ্‌র অভ্যন্তরে যে 'পরীক্ষার যুগ' অতিবাহিত হয়েছিল তার ভয়াবহ পরিণতি হচ্ছে জঙ্গে কারবালা। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এই সময়টাকে নৈতিকতা বনাম অনৈতিকতার প্রকাশ্য সংঘাত হিসেবে চিহ্নিত করে সিয়াসত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সভায় সমবেত সকলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর সুযোগ্য পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর অন্বেষণে বের হন। রক্ত এবং বংশীয় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ছিলেন পিতৃ দিক থেকে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর পৌত্র। মাতৃ দিক থেকে তিনি পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদেগার্দের দৌহিত্র। সেদিক থেকে তিনি পারস্যের রাজ সিংহাসনেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন। উভয়দিক থেকে তাঁর যোগ্যতা ও বৈশ্বিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অভাব ছিলনা। এছাড়া নবিজীর (দ.) বংশধারার তিনিই উত্তরাধিকারী। নবি বংশের নেতৃত্বও তাঁর উপর সমর্পিত হয়েছে। এ জন্যে মদিনার সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। অথচ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগী এবং জ্ঞান চর্চায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। মসজিদে নববিতে তখনো সাহাবী তাবেয়ীগণ ইলম চর্চা ও জ্ঞান বিতরণের ব্যাপক এন্তেজাম করে রেখেছিলেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সেখানে অহর্নিশ সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ তাঁকে বিশেষ সম্মান ও সমাদরে রাখেন। হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্‌, ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং জ্ঞান এতো সমৃদ্ধতর ছিল যে, মহাজ্ঞানী সাহাবায়ে কেরামও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে জ্ঞানের আলোচনায় তৃপ্ত ও পুলকিত হতেন। পারিবারিক ব্যবস্থায় একটু স্থিতি আসার পর তিনি মসজিদে নববিতেই প্রায় সময় অতিবাহিত করতেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে মদিনাবাসীর মসজিদে নববিতে গমন

খিলাফতের প্রস্তাব নিয়ে প্রতিনিধি দল যখন তাঁর সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি মসজিদে নববির একটি নির্জন হুজরায় নিবিষ্টভাবে ওযীফায় রত ছিলেন। হঠাৎ মসজিদে নববিতে বহু লোকের সমাগম শব্দে তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। ইতোমধ্যে নবি বংশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মুসলিম বিশ্ব এবং জনসমাজের ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। এ লক্ষ্যে মুসলমানগণ

তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। ফলে মসজিদে নববির মতো পবিত্র স্থানে বিরাট জন সম্মেলন দেখে তিনি তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হতে অগ্রসর হন। ইমাম যয়নুল আবেদীন সমীপে কুরাইশ বংশীয় নেতা মন্‌যর বিন যুবায়ের আবেদন পেশ করেন। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে মন্‌যর বিন যুবায়ের ইমাম সমীপে নিবেদন করে বলেন যে, "মাননীয় সৈয়দ, মদিনার অধিনায়কত্বের একমাত্র আপনিই অধিকারী। তাই সমবেত জনগণ আপনার আনুগত্য স্বীকার করে আজ আপনাকে মদিনার সিংহাসনে উপবিষ্ট করে স্বীয় কর্তব্য পালন করবে, এই সংকল্প নিয়ে সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আপনি শোকাকুল, আপনাকে বেশি কথা বলে বিরক্ত করতে আমাদের সাহস হচ্ছে না। আমি শুধু এ'টুকু বলতে চাই যে, যাঁরা আপনার এখানে সমবেত হয়েছেন তারা সকলে নবি বংশের দাসানুদাস। আপনার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে সহস্র সহস্র মদিনাবাসী হাসিমুখে আপনার জন্যে প্রাণ বিসর্জন করবে। আপনি এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবেন না। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের খলিফা হয়ে আমাদেরকে বাধিত করুন।"

মন্‌যর বিন যুবায়ের এর বক্তব্যে আন্তরিকতার আবেগ পরিস্ফুট ছিল। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এই জন সমাবেশের আকুল আহ্বানে মমতায় মুগ্ধ হলেন। অত্যন্ত ধীরে এবং শান্তভাবে তিনি জনগণের আবেদনের উত্তর করেন। তিনি বলেন, "ভাই সব, বন্ধুরা, আপনাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমার অন্তরের ভিতর যে দাবানল জ্বলছে, পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, বন্ধুশোক সকল শোকের দাবদাহে যেভাবে আমার মর্মস্থল নিপীড়িত হচ্ছে, তাতে আমি সংসারের কথা, ধনৈশ্বর্য বা সিংহাসনের কথা, কিছুই এখন ভাবতে পারছি না। আমার আপনজন সমস্তই এখন পরপারে, একা আমি এ পারে তাঁদের জন্যে ব্যথার প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছি। আমাকে আর আপনারা দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ করবেন না। আমি মুক্তি চাই। মসজিদের নিভৃত কোণে আমি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি। আমি সেই নিত্য-সদা বিদ্যমান মহান স্রষ্টার সন্ধানে রত– যাঁর নিকট মণি মানিক্য ও সিংহাসন একেবারে মূল্যহীন। আপনারা যদি আমার প্রকৃত হিতৈষী হন তবে আমাকে দোয়া করুন, আমি যেন আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধন লাভ করে নবি বংশের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারি।"

সমবেত জনগণ এই কিশোর অতিক্রান্ত তাপস বালকের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাদের মনোজগত এক ঐশীভাবাবেশে আপ্লুত হয়ে যায়। তাঁর বক্তব্যের পর আর কেউ কোন বাক্যালাপে সাহসী হননি। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। যে প্রতিশোধ স্পৃহা সকলের মধ্যে ঢেউ দিয়ে চিত্তে দোলা দিচ্ছিল তাও কিছুটা প্রশমিত হয়ে যায়। মসজিদে নববি থেকে বের হয়ে তাঁরা দ্রুত গভর্নর

ওসমানকে মুক্তি দেয়। তাঁরা এটিও উপলব্ধি করেন যে, ইমাম যয়নুল আবেদীন সিয়াসতসহ পার্থিব বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর মদিনা ত্যাগ

মদিনাবাসীদেরকে বিদায় করার পরদিন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নগরের কোলাহল এবং জনকল্লোল এড়াবার জন্যে মদিনা হতে চারদিনের পথ নেবু নামক স্থানে চলে যান। নেবু তাঁর মহান পিতা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ক্ষুদ্র জায়গীর। **এখানে পৌঁছে তিনি নিরুপদ্রবে জনশূন্য এক পর্বত গুহায় আল্লাহ্‌র আরাধনায় লিপ্ত হন।** মদিনায় চলমান রাষ্ট্রীয় বিক্ষোভ এবং সংঘাত–সংঘর্ষমুখী পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁকে আর বিভ্রান্ত করার আশঙ্কা থাকেনি। কারণ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র ধারণা ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষ অনিবার্য পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। তিনি তাঁর মহান চাচা হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র মতোই আত্মঘাতি রক্তপাত পরিহার করে মানব জাতিকে সুউচ্চ নৈতিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকাকে উত্তম মনে করলেন।

দশম অধ্যায়

মদিনা বিক্ষোভ বিষয়ে ইয়াযিদের প্রলয়ঙ্করী সিদ্ধান্ত এবং হারারায় গণ্যহত্যা

অহর্নিশ ইয়াজিদ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল-মাতাল মদিনা নগর। মদিনার সার্বিক অবস্থা ইয়াজিদকে অবহিত করে দূত প্রেরণ করেন গভর্নর ওসমান। তিনি ইয়াজিদকে মদিনায় চলমান বিক্ষোভ এবং ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর আত্মসংযম, প্রজ্ঞা এবং মসজিদে নববি থেকে বের হয়ে অন্যত্র গমন ও নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বিষয়টিও ইয়াজিদকে অবহিত করেন। ইয়াজিদ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর ভূমিকা ও অবস্থা জ্ঞাত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। ইয়াজিদ নিশ্চিত হয় যে, মদিনায় চলমান বিক্ষোভে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) জড়িত নন। তবে মদিনাবাসীর ভূমিকাকে ইয়াজিদ "অকৃতজ্ঞতা!" হিসেবে চিহ্নিত করে চরম শাস্তি দানের সংবাদ জানানোর জন্যে নোমান বিন বশীর নামক এক প্রভাবশালী আনসারকে মদিনায় প্রেরণ করে। নোমান বিন বশীর মদিনাবাসীকে ইয়াজিদের ক্রোধ ও আস্ফালনের কথা বিবৃত করে। কিন্তু মদিনাবাসী ইয়াজিদের হুমকি ধমকিতে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হননি। মদিনাবাসী সমস্বরে উল্লেখ করেন যে, আমরা ইয়াজিদকে শাসক হিসেবে অযোগ্য বিবেচনা করেছি এবং তার প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করছি। এতে মদিনাবাসীর অদৃষ্টে যা থাকে তজ্জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। পার্থিব মঙ্গলের জন্যে আমরা ইসলামের "পবিত্র খিলাফত" কলুষিত হতে দিতে পারি না। নোমান বিন বশীর দামেস্কে প্রত্যাবর্তন করে মদিনাবাসীর দৃঢ় মনোভাব এবং সিদ্ধান্ত ইয়াজিদকে অবহিত করে। সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে ইয়াজিদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। ইসলামী খিলাফত এবং নৈতিক বিষয়ে কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নেতৃত্বে প্রথম প্রতিবাদী বিপ্লবের পর মদিনার জনগণ দ্বিতীয়বার প্রতিবাদী বিক্ষোভ, গণবিপ্লব এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

ইয়াজিদ বাহিনীর মদিনা আক্রমণ : ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে গ্রেফতার, গণহত্যা-লুণ্ঠন

ক্রুদ্ধ ইয়াজিদ মদিনার গণ বিস্ফোরণ বিপ্লব দমনের জন্যে বৃহৎ সৈন্যদলসহ মুসলিম বিন ওকবা নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে মদিনায় প্রেরণ করে। মুসলিম তার দুর্বার বাহিনী নিয়ে ঝটিকাবেগে মদিনার পথে ধাবিত হয়। মদিনার জনগণ ইয়াজিদের সামরিক অভিযান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে মদিনায় অবস্থিত উমাইয়াদের সঙ্গে একটা সন্ধি করে নেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন যে, উমাইয়ারা এ ধরনের অভিযানের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন এবং যুদ্ধ চলাকালে কোন প্রকার শত্রুতা বা গুপ্ত তথ্য ইয়াজিদ বাহিনীকে প্রদান করে সাহায্য করবে না। এ ধরনের সমঝোতা ও সন্ধির সময় অন্যান্যদের মধ্যে হযরত উসমান গণি (রা.)'র পুত্র আমর ইবনে উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। ওয়াদিয়ে কুরা নামক স্থানে আমর ইবনে উসমান (রা.) সহ মদিনার উমাইয়া নেতাদের সঙ্গে ইয়াজিদের সেনাপতি মুসলিম বিন ওকবার সাক্ষাত হয়। মুসলিম স্বয়ং আমর ইবনে উসমান (রা.) কে ডেকে মদিনার পরিস্থিতি এবং রণকৌশল কিরূপ হবে তা জানতে চায়। আমর ইবনে উসমান (রা.) দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন যে, "আমি মদিনাবাসীর সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ, আপনার নিকট কিছুই বলতে পারব না।" আমরের জবাব শুনে ক্রুদ্ধ মুসলিম বলে উঠে, "তুমি যদি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)'র পুত্র না হতে তা হলে এক্ষণই আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।" এ সময় গভর্নর উসমান সেনাপতি মুসলিমকে অবহিত করেন যে, এখানে ফকির বেশি এক যুবক আছে, যে অঙ্গীকারে শামিল হয়নি। সে মারওয়ান পুত্র আবদুল মালিক। রাতদিন সে মসজিদে বসে উপাসনা ও কোরআন তিলাওয়াত করে। দেখতে উদাসীন ফকির মনে হলেও আবদুল মালিক ছিল পাকা রাজনীতিক। আবদুল মালিক ছিল মারওয়ান ইবনে হাকামের পুত্র। মক্কা বিজয়ের দিন হাকাম ও তার পুত্র মারওয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের পর হাকাম পবিত্র নগরী মদিনায় চলে আসে। এ সময় সে ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে বিশ্বনবি (দ.), সাহাবায়ে কেরাম এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি মুসলমানদের পদক্ষেপ বিষয়ে শত্রুদের নিকট তথ্য পাচার করে। এ কারণে বিশ্বনবি (দ.) তাকে মদিনা থেকে বহিস্কার করে তায়েফে নির্বাসিত করেন। প্রথম দুই খলিফার খিলাফত কালে সে মদিনায় আসতে পারেনি। হযরত উসমান (রা.) এর আপন চাচা হওয়ার সুবাদে সে তৃতীয় খলিফার সময়ে মদিনায় বসবাস করতে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে হযরত উসমান (রা.) বিশ্বনবি (দ.) কে বারবার অনুরোধ করে অনুমতি নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। হাকামের পুত্র মারওয়ান আরবের সেরা কুটনীতিকের মধ্যে অন্যতম একজন। হযরত

উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে সে খলিফার সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সরল-সহজ এবং রাজনীতির জটিল গ্রন্থি সম্পর্কে অনীহ হযরত উসমান (রা.)'র সীলও একপর্যায়ে মারওয়ান ইবনে হাকামের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মিসরের বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.) সমীপে আগমন করে দাবী-দাওয়া পেশ করার পর খলিফার নিকট থেকে সমাধানের আশ্বাসবাণী পেয়ে মিসরে ফিরে যাবার পথে হযরত উসমান (রা.) এর সীলকৃত চিঠি বিদ্রোহীরা জব্দ করে। এ চিঠিতে মিসরের গভর্নরের প্রতি বিদ্রোহীদের হত্যার নির্দেশ ছিল। ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন মারওয়ানই খলিফার সীল জাল করে উক্ত চিঠি প্রেরণ করেছিল। এ চিঠির ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হিসেবে অত্যন্ত সহজ-সরল দানশীল সাহাবা খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের মতো দুঃখজনক কলংকময় ঘটনা সংঘটিত হয়।

উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকালে মারওয়ান ছিল আমীর মুয়াবিয়ার অন্যতম পরামর্শদাতা। ধূর্ত স্বভাবের মারওয়ান ইয়াজিদের বিধবা স্ত্রী অর্থাৎ খালেদ ইবনে ইয়াজিদের বিধবা মাতাকে বিয়ে করে। মারওয়ান এক পর্যায়ে খালেদ ইবনে ইয়াজিদকে দামেস্কের ভবিষ্যত রাজার পদ থেকে বহিস্কার করে স্বীয় পুত্র আবদুল মালিক ও আবদুল আজিজকে উমাইয়া রাজবংশের উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে। এদিকে খালেদের সঙ্গে অযাচিত আচরণ এবং শাসানোর কারণে ইয়াজিদের বিধবা স্ত্রী একরাতে নিজের শয্যাগৃহে মারওয়ানকে হত্যা করে। এ সংবাদ মদিনায় যখন পৌঁছে তখন আবদুল মালিক মসজিদে নববিতে পবিত্র কোরআন পাঠরত ছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সে পবিত্র কোরআনের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করে ঘোষণা করে যে, "আজ থেকে কোরআনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" এই আবদুল মালিকই পবিত্র মদিনা অভিমুখে প্রেরিত বার হাজার সৈন্যের সেনাপতি মুসলিম ইবনে ওকবাকে মদিনা আক্রমণের পথ বাতলিয়ে দেয়। আবদুল মালিকের (ফকির বেশধারী ভন্ড) পরামর্শক্রমে রোগগ্রস্ত মুসলিম বিন ওকবা হাররার দিক থেকে মদিনা শরিফ অবরোধ করে।

হারারায় গণহত্যা

মুসলিম বিন ওকবা ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনদিনের সময় দিয়ে মদিনাবাসীকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানায়। একই সাথে ইয়াজিদের নির্দেশনা অনুযায়ী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং হযরত আব্বাস (রা.) এর পৌত্র আলী আব্বাসকে আনুগত্য প্রকাশের বিষয়ে চাপ দিতে নিষেধ করে। মুসলিমের নির্দেশ মদিনাবাসী প্রত্যাখ্যান করে এবং বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে সিরিয়

বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। বড় বড় দলে সংগঠিত মদিনাবাসীকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখে মুসলিমের সিরিয় বাহিনী পালাতে থাকে। মূলতঃ প্রত্যেক মদিনাবাসী শুধু যুদ্ধ নয়, একটি বৃহৎ পরিসরের গণবিপ্লব শুরু করে। কিন্তু মদিনার বনি হারিছা পিছনের দিক থেকে সিরিয় বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করায় মদিনার এ গণবিল্পব ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে সিরিয় বাহিনী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে গ্রেফতার করে মুসলিমের সম্মুখে উপস্থিত করে। মুসলিম ইয়াজিদের নির্দেশ অনুযায়ী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং আলী আব্বাসকে মুক্তি দেয়।

মদিনাবাসী ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করায়, দুর্বৃত্ত মুসলিম তিন দিন ব্যাপী মদিনাজুড়ে ঘরে ঘরে প্রবেশ করে হত্যা, লুণ্ঠন এবং নারী ধর্ষণের মতো জঘন্যতম অপরাধে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ ভেদাভেদ না করে ইয়াজিদ প্রেরিত মুসলিম বিন ওকবার বাহিনী গণহত্যা এবং লুণ্ঠনের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। মদিনার প্রতিটি গৃহে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের করুণ আর্তনাদ উত্থিত হতে থাকে। **বিশ্বনবি (দ.)'র পবিত্র গৃহও অত্যাচারীর নির্মম আঘাতে হতশ্রী হয়ে যায়। মদিনার পথে-পথে অলি-গলিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। সংসার বিরাগী ফকির, আউলিয়া-দরবেশগণকে তাঁদের হুজরা থেকে টেনে এনে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করে নগর ত্যাগ করে পর্বত গুহা ও জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। পরবর্তী সময়ে জালিমের জুলুম থেকে পরিত্রাণ এবং নীরব প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে মুসলিম সাধকরা বন-জঙ্গলে অবস্থান করাকে একটি ধ্যান-সাধন পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেন**। এ গণহত্যায় আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা, ফজল ইবনে আব্বাস ইবনে রবী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতীর মতো অভিজ্ঞ ও বড় বড় কুরাইশী সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে হাররার অভিযানে সাতশত ক্বারী ও কোরআনে হাফিজ এবং অসংখ্য সাহাবা শহীদ হন।

হাররা হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিশ্বনবি (দ.) অনেক পূর্বেই সাহাবাদের প্রতি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আইউব ইবনে বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসুলুল্লাহ্ (দ.) সফরে যাবার পথে হাররা যাহরার কাছে অবস্থান করে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করেন। সাহাবায়ে কেরাম এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "তোমাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকগণ এই হাররার কাছে নিহত হবে।" এ বিষয়ে হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধে সাতশত হাফেজে কোরআন শহীদ হন। এর মধ্যে তিনশত সাহাবী ছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা ইয়াজিদের শাসনামলে সংঘটিত হয়। বায়হাকী উল্লেখ করেন, "হাররার যুদ্ধে মদিনার লোকজনকে সমূলে হত্যা করা হয়।" বায়হাকী আরো উল্লেখ

করেন, “মুসলিম ইবনে ওকবা তিনদিন পর্যন্ত মদিনায় লুন্ঠন কার্য চালায় এবং একহাজার অবিবাহিতা কুমারীর ইযযত হরণ করে।” কারবালার পর মদিনা শরিফের উপর আক্রমণ এবং হাররার গণহত্যা দেখে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মানুষের নৃশংসতা, অনৈতিকতা, অমানবিকতা, লোভ, লালসা, জীঘাংসা ও ক্ষমতা লোলুপতা সম্পর্কে আবারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

একাদশ অধ্যায়

ইয়াজিদ বাহিনীর মক্কা নগরী অবরোধ এবং কাবা শরিফে অগ্নি সংযোগ

ইয়াজিদের সেনাপতি মুসলিম ইবনে ওকবা মদিনায় গণহত্যা এবং লুণ্ঠন সম্পন্ন করে মক্কা-মোয়াজ্জমার স্বাধীন শাসক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরকে (রা.) দমন ও সেখানকার জনগণের আনুগত্য আদায়ের অভিপ্রায় নিয়ে মক্কা অভিযানে যাত্রা করে। মক্কা নগরীতে আল্লাহ্র প্রথম গৃহ কাবা শরিফ অবস্থিত। বিশ্বনবি (দ.) ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে খ্রিস্টান শাসক আবরাহা কাবা শরিফ ধ্বংসের জন্যে হস্তী বাহিনী নিয়ে অভিযান চালায়। কিন্তু আল্লাহ্র ঘর আল্লাহ্ স্বয়ং পরম হেফাজতে আবরাহার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ প্রেরিত ক্ষুদ্র আবাবীল পাখির আক্রমণে আবরাহার বিশাল সেনাবাহিনী নিহত হয়। আবরাহা নিজেও ক্ষুদ্র পাখি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত নুড়ি পাথরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কাবা গৃহ চরম শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে বিশ্ববাসীর জন্যে তাওহীদের কেন্দ্রিয় গৃহ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা স্থাপনের বিষয়ে অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। উচ্চাভিলাষী ইয়াজিদের দুর্ধর্ষ সেনাপতি মুসলিম বিন ওকবা শুধুমাত্র ইয়াজিদি দাপট প্রদর্শন এবং রাজ ক্ষমতার পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে কাবা শরিফের মতো পবিত্রতম গৃহে অভিযান চালাতে সংকল্পবদ্ধ হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র মুহূর্তকালীন সিদ্ধান্তের সম্মুখে প্রবল প্রতাপশালী দানবিয় ইচ্ছা শক্তি সেকেন্ডেই নিঃশেষ হয়ে যায়। মক্কা অভিযানে রণোন্মত্ত সেনাপতি মুসলিম ইবনে ওকবা মাশআল নামক স্থানে পৌঁছেই মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম নিজেই হুসাইন বিন নুমাইরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়। হুসাইন বিন নুমাইর মক্কা গমন করে নগর উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে। মক্কা আক্রমণের তথ্য জ্ঞাত হয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা.) নগরীর বাইরে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। মক্কাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ইয়াজিদ বাহিনীর গতিরোধ করেন। প্রতিরোধের মুখে পতিত হয়ে ইয়াজিদ বাহিনী দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে মক্কাবাসীদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়।

এর ফলে মক্কাবাসীরা নগরীর অভ্যন্তরে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তোলেন। এ পর্যায়ে মক্কা দখল সম্ভব নয় নিশ্চিত হয়ে ইয়াজিদ বাহিনী মক্কা নগরী অবরোধ করে।

সম্মুখ যুদ্ধে মক্কা নগরীতে প্রবেশ সম্ভব নয় ভেবে ইয়াজিদ বাহিনী নগরীর বাইরের পর্বতমালা ও উচ্চভূমি হতে প্রস্তর বর্ষণ শুরু করে। এর ফলে নগরীর গৃহরাজি এমনকি পবিত্র হেরেম শরিফ ক্ষতিগ্রস্ত ও ভগ্নশ্রী হয়ে পড়ে। নগরবাসীর আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ না দেখে ইয়াজিদ বাহিনী হাওয়াই বাজির সাহায্যে মক্কার বস্তিসমূহের ভিতর জলন্ত অগ্নি-বলয় নিক্ষেপ শুরু করে। এতে লোকালয় এবং বাড়িঘর পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এমনিতে মক্কা মরুঅঞ্চলভূক্ত, এর উপর রোদের প্রখর তেজ, পানির অভাব তীব্র, অগ্নি নির্বাপন তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। মক্কাবাসীর দুঃখের সীমা নেই। অনন্যোপায় হয়ে মক্কাবাসীরা একান্ত মনে কাবা শরিফের হেফাজতের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়ে পড়ে। হুসাইন ইবনে নুমাইর ক্ষেপণাস্ত্র মিনজানীক দ্বারা কাবা গৃহে পাথর ও অগ্নিবর্ষণ করায় খানায়ে কাবার গিলাফ ও কাঠ পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। হাজরে আসওয়াদ তিন টুকরো হয়ে যায়। এ ধরনের বর্বরতার পরিণতি হিসেবে কাবা গৃহের মহান মালিকের এক অপূর্ব লীলায় ইয়াজিদ বাহিনীর শিবিরে অগ্নি জ্বলে উঠে। এতে অস্ত্রাগার ভস্মীভূত হয় এবং বহু মানুষ পুড়ে মরে। এ ঘটনায় ইয়াজিদ বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা সেনাপতি হুসাইন ইবনে নুমাইরকে আক্রমণ প্রত্যাহার করে দামেস্কে ফিরে যেতে আহ্বান জানায়। মদিনা শরিফ লুণ্ঠন এবং কাবা শরিফ অবমাননার ঘটনাকে তারা চরম বেয়াদবী হিসেবে বিশ্বাস করতে থাকে। সৈনিকদের মনোবল হারিয়ে ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে নুমাইর বলে উঠে, দামেস্ক থেকে ইয়াজিদের নির্দেশ আসলে দামেস্কে ফিরে যাওয়া হবে। ইতোমধ্যে সংবাদ প্রচার হয়ে যায় যে, শিকার শেষে ফেরার পথে ইয়াজিদ দৈবাৎ মৃত্যুবরণ করেছে। ঘটনাটি আবরাহার পরিণতির ইঙ্গিতবহ। সর্বত্র অকল্যাণের আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠলে ইয়াজিদ বাহিনী মক্কা অবরোধ প্রত্যাহার করে দামেস্কে ফিরে যায়। অবরোধ মুক্ত হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা.) নিজেকে মুসলিম জাহানের শাসক ঘোষণা করেন। ইরাক, হিজায, ইয়েমেন ও বসরা তাঁর দাবী মেনে নেয়।

কে এই মুসলিম ইবনে ওকবা

একচক্ষু বিশিষ্ট মুসলিম ইবনে ওকবা হলো আফ্রিকা বিজয়ী সেনাপতি ওকবার পুত্র। কোন এক যুদ্ধে মুসলিমের একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যায়। তার পিতা ওকবা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক সময়ে বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্রতম মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেছিল। বদরের যুদ্ধে ধৃত হলে বিশ্বনবি (দ.) তার প্রাণ বধের হুকুম দেন। তখন ওকবা

বলেছিল “আমার মৃত্যু হলে আমার সন্তানেরা কী খাবে?” বিশ্বনবি (দ.) বলেছিলেন, “দোজখের আগুন!” পরে অবশ্য বিশ্বনবি (দ.) তাকে মুক্তি দেন। কুটনীতিক মারওয়ানের প্রভাবে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) তাকে উচ্চপদে নিয়োজিত করেন। এই ওকবার পুত্র মুসলিমই ইয়াজিদের নির্দেশে মদিনা শরিফ ধ্বংসের দায়িত্ব নেয়। ইতিহাস এই মুসলিমকে অভিশপ্ত খুনী আখ্যা দিয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কুফায় বিদ্রোহ এবং মুখতার ছাকাফীর উত্থান

কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইত হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের পর পবিত্র মদিনা, মক্কা শরিফ, বসরার মতো কুফাতেও গণ প্রতিবাদ ও বিপ্লবের সূচনা ঘটে। ইরাক এমনিতেই সর্বকালে গোলযোগ, অস্থিরতা এবং হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর মর্মান্তিক শাহাদাতের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে দশ হাজার ইরাকী মুসলমান কুফায় জমায়েত হন। এ জমায়েতে কুফাবাসী হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র প্রশ্নে তাঁদের সমর্থিত মক্কাকেন্দ্রিক শাসক ইবনে যুবায়ের (রা.) এর নীরবতা অবলম্বনের সমালোচনা করে সাহাবী সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.) এর নেতৃত্বে প্রতিশোধের ধ্বনি তুলে তাওয়াবীনের আন্দোলন (তওবা তথা অনুশোচনাকারী দল) প্রবলতর করে তোলে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একবার হানী ইবনে হাজ্জাতুল ওয়াদাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর নিকট আগমন করেন। তিনি ইবনে যুবায়ের সমীপে কুফার পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। এসময়ে কুফা থেকে বহিষ্কৃত মুখতার ছাকাফীও আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে উল্লেখ করেন যে, "আপনি আমার পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ আঞ্জাম দিতে পারবেন না। সফলতা অর্জিত হলে আমাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করতে হবে।" মুখতার ছাকাফী ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক। ইয়াজিদ কর্তৃক মক্কা আক্রমণ কালে সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইয়াজিদের দৈবাৎ মৃত্যুর পর অনেকাংশে সহজভাবে ইবনে যুবায়ের মক্কাকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়া রাজ বংশে সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রশ্নে গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ায় ইবনে যুবায়ের মদিনা শরিফ, বসরা এবং ইরাক নিয়ে মক্কা কেন্দ্রিক বিশাল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। হানী ইবনে হাজ্জাতুল ওয়াদাই ইবনে যুবায়েরকে অবহিত করেন যে "ইরাকবাসী তাঁর শাসনের প্রতি অনুগত। তবে সেখানে এমন একটি বৃহৎ দল রয়েছে কেউ যদি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নেন, তাহলে সারা বিশ্বকে তার পতাকাতলে একীভুত করতে সক্ষম হবেন।" হানীর এ বক্তব্য মুখতার ছাকাফীও অবহিত হন। তখন মুখতার ছাকাফী বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমি তাদেরকে সঠিক পথে ঐক্যবদ্ধ

করব এবং তাদেরকে নিয়ে বাতিলের সহযোগিদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করব। সকল জালিম ও শত্রু শক্তিকে ধ্বংস করব।” এ ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুখতার ছাকাফী উমাইয়াদের অন্তঃকলহের দুর্বল মুহূর্তে কুফায় প্রবেশ করেন।

কুফায় গমন করে মুখতার লক্ষ্য করেন যে, সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.)'র নেতৃত্বে কুফাবাসী ঐক্যবদ্ধ। সাহাবীয়াতের চরিত্র থাকায় হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.) ধীর স্থির এবং দৃঢ় পদক্ষেপে আন্দোলন এগিয়ে নিতে প্রত্যয়ী ছিলেন। মুখতার ছাকাফী হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.)'র ধীর স্থিরতাকে দুর্বলতা বলে প্রচার করে অস্থির মতির কুফাবাসীকে সংগঠিত করার নতুন উদ্যোগ নেন। সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.) এর নেতৃত্বকে মুখতার ছাকাফী নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবন্ধকতা মনে করেন। কারণ ধীর স্থির স্বভাবের এই সাহাবা হযরত আলী (রা.)'র বিশ্বস্তদের অন্যতম। দৃঢ়চেতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.) কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণকারী নবি (দ.)'র পরিবারের সদস্যদের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং আবেগকে সুনির্দিষ্ট কল্যাণপ্রদ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে মুখতার ছাকাফী হযরত সুলাইমানকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে হযরত আলীর (রা.)'র অনুগত সমর্থকদের বলেন, ”সুলাইমান একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি নিজেকে এবং তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চান। আমি সুপরিকল্পিতভাবে একটি কাজ করতে ইচ্ছুক। মাহদী ইবনে ওয়াছী মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (হযরত আলী (রা.)'র পুত্র এবং হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসাইন (রা.) এর বৈমাত্রীয় ভাই) আমাকে স্বীয় উযীর ও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছেন। যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতায় মুজাহিদ হিসেবে ধর্মদ্রোহী শক্তিধরকে নস্যাৎ ও আহলে বাইতের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হই। উল্লেখ করা সঙ্গত যে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মাহদী ইবনে ওয়াছী ছিলেন না। তিনি আহলে বাইত নন, বরং “আলাভী” হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুখতার ছাকাফী তাঁর কার্যক্রম এবং উদ্যোগে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার শরণাপন্ন হন। এ সময় মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া মুখতার ছাকাফীকে দোয়া করেন এবং বলেন, “তাঁর দেহ মদিনায় থাকলেও তাঁর অন্তর কুফাবাসীদের সংগ্রামের প্রতি একাত্ম রয়েছে।” উল্লেখ্য যে, কারবালার নির্মম ঘটনাবলীর প্রতিশোধ গ্রহণ প্রশ্নেও জাগতিক নেতৃত্বের কোন্দল স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এ কারণে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সিয়াসত নামের অনৈতিকতার প্রতি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে অনীহ।

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া কেন নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি

মুখতার ছাকাফী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে হযরত আলীর (রা.) পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার নিকট গমন করে দোয়া নেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া কুফার জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে অপারগতা প্রদর্শন করেন। কারণ তিনি দেখেছেন কুফাবাসী তাঁর মহান পিতা হযরত আলী (রা.)'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর মতো পরম ধৈর্যশীল পুণ্যবান আহলে বাইতের সঙ্গেও বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। নবি (দ.)'র প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মতো পবিত্র আহলে বাইত পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদেরকে কুফাতেই ইয়াজিদ বাহিনী শহীদ করে এবং তাঁদের পবিত্র দেহকে ন্যাক্কারজনকভাবে অপমান ও অপদস্থ করে। এ সমস্ত প্রশ্ন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে শোকাভিভূত করে রেখেছে। তাছাড়া মক্কা ও মদিনার প্রশাসন ইবনে যুবায়ের এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইবনে যুবায়ের (রা.) মুখতার ছাকাফীকে মোটেও পছন্দ করেন না। অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ সিরিয়াবাসী উমাইয়াদের প্রতি অনুগত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি কুফাবাসীদের উদ্যোগ-আয়োজনে এবং মুখতার ছাকাফীর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও নেতৃত্ব প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মতি দেননি।

মুখতারের কুফা দখল

মুখতার ছাকাফীর প্রচারণার মুখে হযরত আলী ভক্তদের বিরাট অংশ হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.)'র সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। ফলে মুখতার ছাকাফী নতুন দল গঠনের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যান। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, মুখতার ছাকাফী অসাধারণ সামরিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এতদ সত্ত্বেও সাহাবী হযরত সুলাইমান (রা.)'র সততা, সুউচ্চ মানের নৈতিকতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য ও দৃঢ়তা কুফার সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে মুখতার ছাকাফী উপযুক্ত বিষয়ে অনেকাংশে দুর্বল এবং তাঁর বংশ মর্যাদাও হযরত সুলাইমান (রা.)'র মতো ছিল না। ফলে মুখতার স্বীয় সমর্থকদের সুসংগঠিত এবং উজ্জীবিত রাখার স্বার্থে হযরত আলী (রা.)'র ভাবমূর্তি ব্যবহারকে যথোপযুক্ত মনে করেন। মুখতার ছাকাফীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে হযরত সুলাইমান (রা.) একটি রাত তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মাজারের পার্শ্বে অঝোর কান্নাকাটি এবং বিনয়-প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন। প্রত্যুষে তপঃশুদ্ধ অন্তরে শপথ গ্রহণ করে অস্ত্রধারণ করে ঝটিকাবেগে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হন। সিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হযরত সুলাইমান ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিশোধ স্পৃহা মিটাতে থাকেন। তাঁদের ঝটিকা

আক্রমণে সিরিয়া প্রকম্পিত হয়ে উঠে। দামেস্কের মসনদে আসীন মারওয়ান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় হুসাইন ইবনে নুমাইর এর নেতৃত্বে বিরাট সৈন্য বাহিনীর মাধ্যমে হযরত সুলাইমান (রা.)'র বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে প্রেরণ করে। এ ধরনের অবস্থায় সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিরিয় বাহিনীর সম্মুখে কুফা থেকে আগত মালামাতিয়া (অনুতপ্ত) বাহিনীর ঝটিকা আক্রমণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সাহাবী হযরত সুলাইমান এবং সৈন্যবাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারায়। এই পর্যায়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র নির্মম শাহাদাতের প্রতিশোধ চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নেতৃত্বের প্রশ্নে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় মুখতার ছাকাফী নিজস্ব কৌশলে কুফা দখল করে নেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার নৈতিক সমর্থনের কথা প্রচার করে মুখতার অতি সহজে হযরত আলী (রা.)'র ভক্তদের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তিনি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে কুফাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে ইতোমধ্যে কুফায় নিয়োজিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। এ ঘটনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি মুখতারকে পরাজিত করে কুফা পুনঃদখলের লক্ষ্যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

ইতোমধ্যে মুখতার ছাকাফী নিজস্ব প্রচারণা পন্থা অবলম্বন করে আহলে বাইতের একনিষ্ঠ সহচর, অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুগামী ইব্রাহীম ইবনে আশতারকে নিজের সাংগঠনিক বলয়ে নিয়ে আসেন। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার কারণে ইব্রাহীম আশতার আহলে বাইতের ভক্তদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। মুখতার ছাকাফী কৌশলে ইব্রাহীম আশতারকে নিজের অধীনে এনে সমগ্র কুফায় ব্যাপক গণবিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হন। কুফাবাসীদের প্রচণ্ড আবেগকে তেজোদ্দীপ্ত সশস্ত্র পন্থায় এগিয়ে নেয়ার জন্যে তিনি হযরত আলী (রা.)'র "কুরসীর" প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি প্রচার করেন যে, কুফাতে অবস্থানকালে হযরত আলী (রা.) একটি নির্দিষ্ট কুরসীতে (চেয়ার) বসতেন। শিয়া সম্প্রদায় এ চেয়ারকে "শরতুল্লাহ্" নামে আখ্যায়িত করত। এ ধরনের কোন কুরসীতে আদৌ হযরত আলী (রা.) আসন গ্রহণ করেছেন কিনা তা বিভিন্ন মহলে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। কারণ সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অহর্নিশ অভ্যস্ত হযরত আলী (রা.)'র বিশেষ কোন কুরসীর বিষয় তাঁর অতি সংযত জীবনাচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে মুখতার ছাকাফী যে পুরাতন চেয়ারটি সংগ্রহ করেছিলেন তাতে রেশমীর গিলাফ জড়িয়ে, আতর গোলাপ এবং বিভিন্ন রকমের মূল্যবান সুগন্ধি ছড়িয়ে, সুন্দর সিন্দুকে ভর্তি করে গণ জিয়ারতের জন্যে জামে মসজিদে রেখে দেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে বনি

ইসরাইলকে বিজয় ও সাহায্যের নিদর্শন স্বরূপ, "তাবুতে সকিনাহ্" (হযরত ইউসুফ আ.'র স্মৃতি জড়িত সিন্দুক) দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে এ উম্মাহ্র জন্যেই এ চেয়ারটি প্রেরণ করেছেন। মুখতারের মুখে এ চেয়ারের কারিশমা শ্রবণ করে কুফাবাসী জীবন-মরণ পণ করে সিরিয় বাহিনীকে প্রতিরোধে এগিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে কুফাতে গণ বিপ্লব চলাকালে ইবনে যিয়াদ মসৌলে ছিল। কুফা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর নিয়ন্ত্রণে থাকায় ইবনে যিয়াদ মসৌলে চলে যায়।

সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে মুখতার ছাকাফী মসৌল দখলের জন্যে ইব্রাহীম ইবনে মালিক ওশতার এর নেতৃত্বে হযরত আলী (রা.)'র কথিত চেয়ার সম্মুখে প্রেমাবেগে রেখে রণোন্মাদ হাজার হাজার কুফাবাসীকে মসৌল আক্রমণের জন্যে প্রেরণ করেন। মুখতার ছাকাফী নিজে ইবনে যিয়াদের আসনে বসে রাজ প্রাসাদে অবস্থান নেন। অকল্পনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধায় নুহ্য কুফা বাহিনী হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাত এবং তাঁর নিষ্প্রাণ পবিত্র দেহের প্রতি পাশবিক অবমাননার যথার্থ প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার নিয়ে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে মসৌলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইব্রাহীম ইবনে মালিক ওশতার মসৌলে প্রবেশ করে জাব নদীর তীরে শিবির গড়ে। পরবর্তী দিবসে হঠাৎ ইবনে যিয়াদ বাহিনী ভীমবেগে কুফাবাসীকে আক্রমণ করে। সেনাপতি ইব্রাহীম অতিদ্রুত "শরতুল্লাহ্" নামের আসন খানি কুফা বাহিনীর সম্মুখে উত্তোলন করে সৈনিকদের মধ্যে জীবন-মরণ পণ অবস্থা সৃষ্টি করে ইবনে যিয়াদের আক্রমণ প্রতিহত করার আহ্বান জানান। "শরতুল্লাহ্" নামের চেয়ার দৃশ্যমান হবার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ এতো উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হন যে তারা বীর বিক্রমে ইবনে যিয়াদ বাহিনীকে রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত করে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ইবনে যিয়াদ নিজেই উন্মুক্ত অসি নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খ্যাতনামা যোদ্ধা ইবনে যিয়াদ কুফাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করার জন্যে বিভিন্নভাবে রণকৌশলে মত্ত হয়। কিন্তু পাপের ষোলকলা পূর্ণ করা ইবনে যিয়াদ অবশেষে কুফা বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের বর্শাফলকে বিদ্ধ হয়ে অশ্ব হতে ভূতলে পতিত হয়। সেখানেই কুফার সৈনিকরা তার শিরশ্ছেদ করে খন্ডিত মস্তক মুখতার ছাকাফীর দরবারে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র পবিত্র শির যেভাবে ইবনে যিয়াদ সমীপে উপস্থাপন করা হয়েছিল অনুরূপভাবে ইবনে যিয়াদের মস্তকও মুখতার ছাকাফীর সম্মুখে পেশ করা হয়। এরপর সীমার, ওমরুসহ ইয়াজিদী বর্বরতার চিহ্নিত সকল পাষন্ডের শিরশ্ছেদ করা হয়। এ ঘটনায় ইরাকজুড়ে মুখতারের জয় জয়কার অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি সাধারণ জনগণের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে স্বাধীন নৃপতি হিসেবে কুফার শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের নির্দেশে কুফা আক্রমণ ও মুখতারের পতন

কুফা জয় করে মুখতার ছাকাফী মক্কার স্বাধীন শাসক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর নিযুক্ত শাসন কর্তাকে বিতাড়িত করে নিজে কুফার মসনদ দখলে নেন। অঙ্গীকার অনুযায়ী তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। মুখতারের এ ধরনের পদক্ষেপ এবং কার্যকলাপ আবদুল্লাহ্ ইবেন যুবায়ের মেনে নেননি। তিনি বসরার শাসনকর্তা তাঁর আপন ভ্রাতা মুস'আব ইবনে যুবায়েরকে অনতিবিলম্বে কুফা দখলের নির্দেশ দেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ইরানে নিযুক্ত তাঁর সেনাপতি মহলবকে মুস'আব ইবনে যুবায়ের কর্তৃক মুখতারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণে সেনাবাহিনী নিয়ে পুরোদমে আক্রমণ চালিয়ে মুখতারের পতন নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। এ ধরনের তুমুল সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে মুখতার ছাকাফী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুস'আব বাহিনীর গতিরোধে এগিয়ে যান। যুদ্ধ শুরু হলে মুস'আব বাহিনীর অধিনায়ক মহলব কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে মুখতার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বলেন, "ভাই সব! তোমরা কেন অকারণে মরণকে আলিঙ্গন করতে এসেছ? তোমাদের তো ইমাম নেই। তোমাদের নেতা মুখতারতো ইমাম নহেন। তোমাদের বর্তমান ইমাম হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের। একমাত্র তিনিই নেতৃত্বের অধিকারী। তোমরা তাঁর শরণাপন্ন হও। তোমাদেরকে মার্জনা করা হবে।"

মুস'আব ইবনে যুবায়ের এর পক্ষ থেকে মহলবের এই বক্তব্য চির চঞ্চল, অস্থির মতি কুফাবাসীকে বিচলিত করে তোলে। মহলবের এ ধরনের ঘোষণায় মুখতার পক্ষের চৌদ্দ হাজার সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে দলত্যাগ করে মুস'আব বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সেনাবাহিনীতে এ ধরনের ভগ্ন পরিস্থিতিতে মুখতারের প্রতিরোধ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুখতার বাহিনী অবশেষে দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকে।

এমতাবস্থায় মুস'আব দুর্গবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নির্বোধ কুফাবাসীগণ, তোমরা কেন আর মুখতারের সঙ্গে রয়েছ? তার সঙ্গে থাকলে তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। তোমরা আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাদেরকে মুক্তি দেব।" এ ধরনের আহ্বানে অবশিষ্ট ছয় হাজার সৈন্য মুস'আব ইবনে যুবায়েরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। প্রায় নিঃসঙ্গ মুখতার মাত্র নব্বইজন ভক্ত বীর নিয়ে দুর্গ থেকে বাইরে এসে মুস'আব বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে নিজেকে কোরবানী দেন।

মুখতারের পতনের পর মুস'আব কুফার সিংহাসনে বসেন। মহান আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়–ইচ্ছা অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত। রাজ প্রাসাদের যে টেবিলে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর খন্ডিত পবিত্র শির ইবনে যিয়াদের সম্মুখে রাখা হয়েছিল, যে টেবিলে দুষ্কর্মা-জল্লাদ দাম্ভিক ইবনে যিয়াদের অহমিকাপূর্ণ মস্তক মুখতারের সম্মুখে স্থাপিত হয়েছিল, একই টেবিলে মুখতারের দেহ বিচ্ছিন্ন শির মুস'আব ইবনে যুবায়েরের সম্মুখে রাখা হয়। অবশেষে মুখতারের খণ্ডিত শির আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়েরের সমীপে মক্কায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে এই শির পবিত্র কাবাগৃহের দরজার সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মুখতারের দেহ থেকে দুটি হাত বিচ্ছিন্ন করে কুফার মসজিদের বাইরে প্রদর্শনীর মতো ঝুলিয়ে দেয়া হয়। একই সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী বন্দী দুর্গবাসীদেরকে মুস'আব সম্মুখে হাজির করা হয়। মুস'আবের নির্দেশে এদের সবাইকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। অথচ এদের আত্মসমর্পণকালে মুস'আব তাদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছিলেন। উম্মাহ্‌র তৎকালীন নেতৃবৃন্দের ওয়াদা ভঙ্গের এটি একটি নমুনা– যা কখনো আল্লাহ্‌ এবং রাসুল (দ.)'র আদর্শ ছিল না।

চতুর্দশ অধ্যায়

উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের কুফা জয় এবং মক্কা অভিযান

কুফায় মুখতারের উত্থানের ফলে মক্কা এবং দামেস্কের মাঝখানে একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। মুখতারের পতন এ ব্যবধান দূর করে ত্রিপক্ষীয় সংঘাতের সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দেয়। এখন উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক এবং মক্কার শাসক আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর মধ্যে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী হয়। মুখতারের পতনের পর মুস'আব কর্তৃক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ কুফাবাসীকে মর্মাহত এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এরা দ্রুত এ ধরনের বর্বরতার অবসান চায়। কুফার একটি পক্ষ এবং শিয়া সম্প্রদায় শাসক পরিবর্তনের লক্ষ্যে উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের নিকট বার্তা পাঠায়। আবদুল মালিক স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারে এমনিতেই উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি কুফাবাসী তথা ইরাকীদের প্রতিশ্রুত সাহায্য এবং সুদক্ষ সিরিয় বাহিনীর সহযোগিতায় খালেদ বিন আবদুল্লাহ্কে মুস'আব ইবনে যুবায়ের এর মোকাবিলায় বসরায় প্রেরণ করেন। খালেদ প্রথমত সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বসরার জনগণকে আবদুল মালিকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানায়। এতে অনেক লোক মুস'আবের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে আবদুল মালিকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এধরনের দল বদলের পরিস্থিতিতে আবদুল মালিক সসৈন্যে কুফায় উপনীত হয়ে মুস'আবের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তুমুল যুদ্ধে মুস'আব পরাজিত ও নিহত হন। বসরাসহ সমগ্র ইরাক আবদুল মালিকের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ইবনে যুবায়ের এর অধিকার মুক্ত হয়।

আবদুল মালিকের মক্কা জয় এবং ইবনে যুবায়ের এর পতন

ইরাক জয়ের পর আবদুল মালিক মক্কা দখলের প্রতি দৃষ্টি দেন। এ জন্যে তিনি দুর্ধর্ষ এবং হিংস্র স্বভাবের সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিশাল সেনাবাহিনী মক্কায় প্রেরণ করেন। প্রাথমিক যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনী পরাজিত হলে আবদুল মালিক দামেস্ক থেকে আরো একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। হজের সময় সমাগত হওয়ায় সৈন্যরা আপাতত মক্কা আক্রমণ স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিলে হাজ্জাজ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং পাহাড়ের শীর্ষে পাথর উৎক্ষেপণ যন্ত্রের মাধ্যমে কাবা গৃহে প্রস্তর নিক্ষেপ করে। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)'র মতো তাপস ব্যক্তিত্বের আহ্বানে হজের দিনগুলোতে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়। তবে হাজ্জাজ বাহিনী মক্কা অবরুদ্ধ করে রাখে। এতে অনেক হাজী প্রাণ-হারান। হজ সমাপ্তির পর পরই হাজ্জাজ পুনরায় তুমুল বৃষ্টির মতো পাথর বর্ষণ শুরু করে। এতে পবিত্র কাবাগৃহের ইমারত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের নিরাপত্তার স্বার্থে কাবা গৃহে আশ্রয় নেন। মক্কা অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ ধরনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে ইবনে যুবায়ের এর অনেক সমর্থক দলত্যাগ করে মদিনা শরিফ অভিমুখে চলে যান। এ দিকে পবিত্র কাবা ঘরে অগ্নিসংযুক্ত তৃণ-বলয় নিক্ষেপ করা শুরু হয়। সৈন্যরা কাবা গৃহে অগ্নি প্রয়োগে সাহস করেনি। তখন হাজ্জাজ নিজে অগ্রবর্তী হয়ে অগ্নিবর্ষণ শুরু করে। এতে কাবাগৃহে আগুন লেগে যায়। কাবা গৃহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় ইবনে যুবায়ের এর দুই পুত্রও পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করে মদিনা শরিফে চলে যান। এ ধরনের নিঃসঙ্গ পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের স্বীয় মাতা পরম সম্মানিতা হযরত আসমা সিদ্দিকা (রা.) সমীপে সিদ্ধান্তের জন্যে উপস্থিত হন। ইবনে যুবায়ের বলেন, "আম্মাজান! আমার সকল অনুচর এমনকি আমার পরিবার পরিজন আমার সঙ্গ পরিহার করেছে। যৎসামান্য যারা অবশিষ্ট তারাও বেশিক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না। এমন পরিস্থিতিতে বিজয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে আমার প্রতিপক্ষ আমাকে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।" পরিস্থিতি বর্ণনা করে ইবনে যুবায়ের তাঁর মাতার অভিমত চান। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা হযরত আসমা (রা.) নিঃশঙ্ক চিত্তে জবাব দেন, "বৎস! তুমি সত্য বা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে বলে যদি বিশ্বাস কর এবং সত্যের দাওয়াতই যদি দিয়ে থাক, তাহলে তুমিও আপন শহীদ সাথীদের মতো ন্যায়ের পথে স্বীয় জান উৎসর্গ করে দাও। নিজের লাগাম বনি উমাইয়ার দাসদের হাতে তুলে দিও না। ইমাম হোসাইনের (রা.) মতো সমর ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে যশস্বী হও, বীরের ধর্ম রক্ষা করো।" এরপর হযরত আসমা (রা.) বলেন, "আর দুনিয়া কামাই যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার প্রতি

রয়েছে আফসোস যে, তুমি নিজের জানকেও ধ্বংসের মুখে নিপতিত করেছ এবং সাথীদেরকেও হত্যা করিয়েছ। তুমি যদি বল আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, কিন্তু সাথীদের দুর্বলতার দরুণ এ মুহূর্তে মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমার নেই। তাহলে সাহস হারানো অভিজাত ও ধার্মিকের আদর্শ নয়। দুনিয়া সর্বদা থাকার স্থান নয়। সত্যের পথে আত্মোৎসর্গ করাই শ্রেয়।" মায়ের অকুতোভয় মনোভাব এবং দীপ্ত ঈমানি শিখা লক্ষ্য করে ইবনে যুবায়ের বলেন, "আম্মাজান! আমার মৃত্যুর কোন ভয় নেই। অবশ্য ভয় হলো আমার শত্রুপক্ষ হত্যার পর আমার নাক কান কেটে বিকৃত করে দেবে এবং আমার মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।"

প্রত্যুত্তরে হযরত আসমা (রা.) বলেন, "বৎস! বকরী জবেহ করার পর তার চামড়া উঠিয়ে নিলে কোন কষ্ট হয় না। চামড়া, যা ইচ্ছে তাই করে ফেলে। আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর ভরসা করো।" মায়ের অসীম সাহস এবং অভিপ্রায় লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের জননীর মাথা চুম্বন করে আরজ করেন, "আমি আপনার সাথে একমত। আমি দুনিয়ার দিকে কখনো ঝুঁকিনি। পার্থিব জীবন আমার অপছন্দনীয়। আমি শহীদ হলে আপনি চিন্তিত হবেন না। পরিস্থিতি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করবেন।" হযরত আসমা (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, "আশা করি তোমার বিয়োগান্তিক আঘাত ধৈর্য-শোকর সহকারে বরদাশত করতে পারব। যাও আল্লাহ্‌র নামে স্বীয় কাজ করো।"

হযরত আসমা (রা.) স্বীয় পুত্রকে দোয়া করে বিদায় দেয়ার সময় লৌহবর্ম এবং যুদ্ধসাজ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "বাবা মৃত্যুর জন্যে উৎসর্গীকৃতরা পোশাক পরিধান করে না। এ গুলো খুলে ফেলো।" মায়ের আদেশে যুদ্ধ পোশাক খুলে জামা-পায়জামা পরিধান করে জনাকয়েক সাথীকে নিয়ে ইবনে যুবায়ের শত্রু সৈন্যের কাতারে ঢুকে পড়েন এবং শত্রু কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এক উমাইয়া সৈনিকের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর হাজ্জাজ তাঁর মাথা কেটে দামেস্কে আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করে এবং মৃতদেহ জাহুন নামক স্থানে কূলিতে লটকিয়ে দেয়। এভাবে সমগ্র আরব-আজম পুনরায় উমাইয়া কর্তৃত্বে চলে আসে।

ত্রিমুখী যুদ্ধের নায়কদের পরিচিতি

কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং পরবর্তী সময়ে ব্যাপক গণ বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় হিজাজ, কুফা এবং দামেস্ক কেন্দ্রিক ঘটনাপঞ্জীর নায়কদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মাধ্যমে তৎকালীন নেতৃত্বের স্বভাব-চরিত্র, আকাঙ্ক্ষা উচ্চাভিলাষ

সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া দরকার। কারণ আরব-আজম জুড়ে এতো পরিবর্তন এবং উত্থান পতনের মধ্যেও কেন ইমাম পরিবারের জীবিত একমাত্র পুরুষ সদস্য নির্মোহ ছিলেন এবং কেন তিনি এ সব ঘটনা সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করেছেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে ইয়াজিদ, আবদুল মালিক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, মদিনা বিক্ষোভের নেতা মনযর বিন যুবায়ের, মক্কা বিক্ষোভের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, মুস'আব ইবনে যুবায়ের এবং মুখতার ছাকাফীর পরিচিতি প্রদান করা প্রয়োজন।

(১) ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ হচ্ছে উমাইয়া বংশীয় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের রক্ষিতা এক বেদুইন রমণীর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের পুত্র। আমীর মুয়াবিয়া তাকে "বাঁদীবাচ্চা" বলতেন। তবে যে কোন কুটনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠন এবং নির্মম কাজ সম্পাদনের জন্য আমীর মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ্কে ডেকে দায়িত্ব প্রদান করতেন। এ লোকের সন্তান হলো ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। স্বভাব চরিত্রে সে পিতার চেয়ে নিষ্ঠুর, নির্মম, বর্বর ছিল। সবকিছু অসি এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে সে উদগ্রীব থাকত। কুফার শাসনভার গ্রহণ করে সে ছদ্মবেশে হিজাযী পোশাক পরিধান করে। তলোয়ার কণ্ঠে ঝুলিয়ে, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে মাথায় কালো আমামা, বাম বগলে ধনুক এবং দক্ষিণ হস্তে কালো আশা (লাঠি) ধারণ করে, সে একমাত্র গোলামকে নিয়ে উষ্ট্রপৃষ্ঠে নগরে প্রবেশ করে। তার অনুচর রক্ষীগণ তাকে আগে পিছে অনুসরণ করে। তার এ ধরনের ছদ্মবেশ কুফাবাসীরা বুঝতে পারেনি। এরা বেশভূষার কারণে তাকে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ধারণা করে অহরহ সালাম জানাতে থাকে। সে মুখে কোন জবাব না দিয়ে শুধু হাত তুলে সালামের জবাব দেয়। পরবর্তী সময়ে সে কারবালা হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব গ্রহণ করে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করে।

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের হলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র দৌহিত্র। তাঁর পিতা হলেন আশ্‌রায়ে মোবাশ্‌শারা হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)। তাঁর মাতা হলেন হিজরতের সহযোগী পরম সাহসী, বিদুষী মহিলা হযরত আসমা সিদ্দীকা (রা.)। তাঁর মাতা হযরত আসমা সিদ্দীকা (রা.) নবি (দ.)'র পরম স্নেহধন্য কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)'র অন্তিম অবস্থার সময়ে পাশে থেকে সেবা যত্ন করেছেন। অছিয়ত অনুযায়ী তিনি ওফাতের পর হযরত ফাতেমা (রা.)'র পবিত্র দেহকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে আবৃত রেখে সর্বসাধারণের অলক্ষ্যে সংরক্ষণ করেন এবং দাফন সম্পর্কিত গোপনীয়তা বজায়

রাখেন। এমনকি তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)'র ওফাতের খবর তাঁর মাননীয় পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেও অবহিত করেননি।

কারবালার বিষাদপূর্ণ ঘটনা পরবর্তীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ইয়াজিদের শাসন এবং কুকীর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে হিজাজের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কাবা গৃহের দ্বারপ্রান্তে সমবেত বিক্ষুব্ধ জনগণের সম্মুখে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে তিনি আহলে বাইত সদস্য এবং ইমাম হোসাইন (রা.)'র নির্মম শাহাদাতের প্রতিবাদে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ইমাম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার করেন। ইয়াজিদের সময়ে মক্কা নগরী অবরুদ্ধ হলে তিনি পবিত্র কাবা গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। ইয়াজিদের মৃত্যুর পর অবরোধ প্রত্যাহার হলে তিনি নিজেকে মুসলিম জাহানের খলিফা দাবী করেন। এ সময় মক্কা, মদিনা, ইয়েমেন, বসরা, কুফাসহ সমগ্র ইরাক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে তিনি মুখতার ছাকাফীর পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্ত হন। এ সময় মুখতার ছাকাফী তাঁর নিকট যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ পদের দাবী জানান। হযরত ইবনে যুবায়ের মুখতারকে ভাল পদে সমাসীন করবেন বলে কথা দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা রক্ষা করা হয়নি বলে মুখতার ছাকাফী ইবনে যুবায়ের এর সঙ্গ ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, ইবনে যুবায়ের নয় বৎসরের অধিক সময় হিজাজ, ইরাক, বসরা, ইয়েমেন অঞ্চলে নিজস্ব ধারায় খিলাফত পরিচালনা করেন। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেনাপতিত্বে মক্কা অবরোধ এবং আক্রমণ হলে তিনি কাবা শরিফে আশ্রয় নেন। পরে মাতৃ নির্দেশে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়ে শহীদ হন। তাঁর নির্দেশে তাঁর ভাই মুস'আব ইবনে যুবায়ের কুফা আক্রমণ করে মুখতার ছাকাফীকে হত্যা করে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ইবনে যুবায়ের সমীপে প্রেরণ করা হলে তা পবিত্র কাবাগৃহের দরজার সম্মুখে ঝুলিয়ে রেখে নির্মম দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

যুদ্ধে সিরিয় বাহিনীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করার পর ইবনে যুবায়েরের দেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন করে দামেস্কে আবদুল মালিক সমীপে উপস্থাপন করা হয়। প্রাণত্যাগের পর সিরিয় বাহিনী আনন্দের আতিশয্যে "নারায়ে তকবীর" ধ্বনি দেয়। এ ধ্বনি শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) লোক সম্মুখে বলেন, "এদের প্রতি লক্ষ্য করো, সাহাবা-ই কিরাম ইবনে যুবায়ের এর জন্মের আনন্দে উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর দিয়েছিলেন, আর এখন তাঁর শাহাদাতের আনন্দে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছে।" উল্লেখ্য যে, আমীর মুয়াবিয়া যখন ইয়াজিদকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তখন যে কয়জন ব্যক্তিত্ব এই নিয়োগকে অগণতান্ত্রিক এবং জনঅধিকার বঞ্চিতকরণ হিসেবে উল্লেখ করে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁদের অন্যতম একজন হলেন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা.)। কাবা গৃহে তাঁর অবস্থানের কারণে পবিত্র কাবা গৃহ দুইবার আক্রান্ত হয়। একবার ইয়াজিদের নির্দেশে হুসাইন বিন নুমাইর এবং সর্বশেষ আবদুল মালিকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাবা শরিফের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং গৌরব ও সম্মান বিনষ্ট করে।

আহলে বাইত, পাক পঞ্জতনের অন্যতম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) যখন কুফাবাসীর বার বার আমন্ত্রণে ইরাক অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইয়ের জানতে পেরে তাঁকে হেরেম শরিফে বসে মুসলিম দুনিয়ার প্রতি খিলাফতে তাঁর আনুগত্যের দাওয়াত দিতে অনুরোধ করেন। এ ধরনের প্রস্তাবের জবাবে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের কে অবহিত করেন যে, "আমি আমার আব্বাজানের (মওলা আলী রা.)'র নিকট শুনেছি, হেরেম শরিফের একটি ব্যাঙই হেরেম শরিফের অবমাননার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমি সে ব্যাঙ হতে চাইনা।"

(৩) মুস'আব বিন যুবায়ের হলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছিলেন ইবনে যুবায়ের নিযুক্ত বসরার শাসনকর্তা। ইবনে যুবায়ের এর নির্দেশে তিনি কুফা আক্রমণ করেন এবং মুখতার ছাকাফীকে হত্যা করে দেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন করে কাবা শরিফে অবস্থানরত স্বীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ যুবায়ের এর নিকট প্রেরণ করেন। কুফা অবরোধ এবং তুমুল যুদ্ধ চলাকালে তাঁর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বানে মুখতার ছাকাফী বাহিনীর ছয় হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা দলত্যাগ করেন। এ ঘটনার ফলে অতি দ্রুত মুখতার ছাকাফীর পতন ঘটে। যুদ্ধশেষে কুফা প্রাসাদে বসে মুস'আব মুখতারের দলত্যাগী সদস্যদের নিরস্ত্র করে সমবেত জনতার সম্মুখে এনে একে একে সবাইকে হত্যা করেন। এ ধরনের নির্মম সিদ্ধান্ত ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, মুস'আব ইবনে যুবায়ের কর্তৃক পরিচালিত এ ধরনের নৃশংসতা শ্রদ্ধাভাজন সাহাবীরা কখনো সমর্থন করেননি। কুফা বিজয়ের পর মুখতারের খণ্ডিত শির নিয়ে মক্কা শরিফে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের সমীপে গমনকালে পথে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)'র আস্তানায় উপনীত হন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বাইরে আসলে মুস'আব তাঁকে সালাম জানান। কিন্তু হযরত ইবনে উমর (রা.) মুস'আবের সালাম গ্রহণ করেন নি। মনোক্ষুন্ন মুস'আব বিষয়টি জানতে চাইলে হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, "তুমি ছয় হাজার মুসলমানকে ক্ষমা করার ওয়াদা দিয়ে তা রক্ষা না করে তাদের কতল করেছ। এর চাইতে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে? জবাবে মুস'আব বলেন, "এরা মুসলমান নয়, বিশ্বাসঘাতক কাফির।" জবাবে হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, "এরা কাফির হোক আর মেষপালক হোক, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবকে বিনা অপরাধে বিনাশ করবার কোন অধিকার তোমার কিংবা

কারো নেই। প্রতারণাপূর্বক বিনাশ আরো মারাত্মক অপরাধ। ইসলাম কখনো এ সব অনুমোদন করে না।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এ ধরনের নির্মমতায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। অবশ্য পরবর্তীতে আবদুল মালিকের নির্দেশে কুফা আক্রমণ হলে মুস'আব ইবনে যুবায়ের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

(৪) কারবালা প্রান্তরে বর্বরতার বিরুদ্ধে মদিনায় সর্বপ্রথম গণবিক্ষোভ শুরু হয় আনসার নেতা **আবদুল্লাহ্ বিন হানযালার** নেতৃত্বে। সকল মদিনাবাসী তাঁর সাহসী নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং বিক্ষুব্ধ জনগণই তাঁকে নেতা নির্বাচিত করেন। কিন্তু কুরাইশ নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর ভাই মনযর বিন যুবায়ের আনসার-মুহাজির প্রশ্ন উত্থাপন করে হানযালার নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হননি। হানযালা নিজেও নেতৃত্বের জন্যে লালায়িত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি নবি (দ.) বংশের অনুরাগী হিসেবে পরম মহব্বতে গণ বিক্ষোভের সূত্রপাত করেছিলেন। অবশ্য মনযর বিন যুবায়ের মদিনার অধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্যে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অপারগতা প্রকাশ করে তাঁকে বিদায় করেন। মদিনা বিক্ষোভ দমনের জন্যে জালিম ইয়াজিদ মুসলিম বিন ওকবাকে প্রেরণ করলে সে মদিনার শরীফী অবস্থানকে চরমভাবে অপমানিত করে। তিনদিন ধরে বিশ্বনবি (দ.) এর চিরস্থায়ী নিবাস স্থান মদিনায় সিরিয় বাহিনীর গণলুন্ঠন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন চলে। মদিনা বিক্ষোভের নেতৃত্ব দানকারী মনযর বিন যুবায়ের যুদ্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র অবস্থায় সঙ্গীগণসহ প্রাণ হারান।

(৫) কুফা বিপ্লবের নেতা **মুখতার ছাকাফী** হলেন পারস্য বিজয়ের প্রাথমিক সময়ে যুদ্ধ সমূহের অন্যতম সেনাপতি আবু ওবায়দা ছাকাফীর (আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা.) নন) পুত্র। নামারিকের যুদ্ধে সেনাপতি মুসান্না এবং আবু ওবায়দার যৌথ বাহিনীর আক্রমণে পারস্য বীর রুস্তমের নেতৃত্বাধীন পারসিক বাহিনী পরাজিত হয়। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য পারসিক বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সমবেত হয়। এ সময় মুসান্না এবং আবু ওবায়দার যৌথ নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী নদীর পশ্চিম তীরে ব্যাবিলনের নিকটে অপেক্ষারত ছিল। ইউফ্রেটিস নদীর উপর কোন সেতু না থাকায় নৌকা ব্যতীত পারাপারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেনাপতি আবু ওবায়দা ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করে পারসিক বাহিনীকে আক্রমণের জন্যে একটি নৌকার সেতু নির্মাণ করেন। আবু ওবায়দা সেনাপতি মুসান্নার পরামর্শ উপেক্ষা করে নৌকার সেতু দিয়ে নদী পার হয়ে পারসিক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। নৌকার সেতু অতিক্রম করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় এটি ইতিহাসে "সেতুর যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে পারসিকদের বিশাল হস্তীবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারায় আবু ওবায়দা

হস্তীর পদতলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান। এই মর্মান্তিক যুদ্ধে ছয় হাজার মুসলিম সেনা শহীদ হন। সেনাপতি আবু ওবায়দার পুত্র মুখতারকে স্বভাব প্রকৃতিতে অস্থিরমতি, ধুর্ত এবং সুযোগ সন্ধানী হিসেবে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন। তিনি আহলে বাইত হযরত আলী (রা.)'র শাহাদাতের পর যখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব নেন তখন তাঁর বিরোধিতা করেন। কারবালা যুদ্ধের পর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের এর নেতৃত্ব স্বীকার করে পদ-পদবীর আশায় মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু ইবনে যুবায়ের তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। পরে তিনি মক্কায় কুফাবাসী হানী ইবনে হাজ্জাতুল ওয়াদাঈ এর সঙ্গে সাক্ষাত করে কুফায় আসেন। কুফায় এসে তিনি হযরত সুলাইমান ইবনে সাদ (রা.) এর নেতৃত্বে পরিচালিত "তাওয়াবীনের আন্দোলনে" যুক্ত হন। নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি হযরত সুলাইমান (রা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি অপপ্রচার চালিয়ে হযরত আলী (রা.)'র প্রেমাসক্ত সমর্থকদের বিভ্রান্ত করে "তাওয়াবীন আন্দোলনে" বিভক্তি সৃষ্টি করেন।

ইতোপূর্বে ইবনে যুবায়েরের সান্নিধ্যে আসার আগে তিনি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সঙ্গে সাক্ষাত করে কারবালা হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সংঘটিত গণবিস্ফোরণ সমূহে নেতৃত্ব দানের অনুরোধ করেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মুখতার ছাকাফীকে কোন প্রকার সহযোগিতা না করার জন্যে তাঁর চাচা হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া (রা.) এর প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এরপরেও মুখতার ছাকাফী মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে প্রচারণা চালান। তিনি নিজেকে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার প্রধান উজীর হিসেবে ঘোষণাও দেন। নিজের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তিনি হযরত আলী (রা.)'র অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুগামী সিফ্ফিনের যুদ্ধের আপোষহীন সেনাপতি মালিক আশতারের পুত্র ইব্রাহীম ইবনে আশতারের সমর্থন এবং পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্তির স্বার্থে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার জাল চিঠি প্রদর্শন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে মুখতার কুফার নেতৃত্বে আসীন হন। তবে এটি সত্যি যে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে ইবনে যিয়াদ পরাজিত ও নিহত হয়। তিনি অবশ্য নির্মম পন্থায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র হত্যাকারীদের শিরশ্ছেদ করে চরম প্রতিশোধ নেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আরব ভূখন্ডে রক্তক্ষয়ী পালা বদলে কেন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নীরব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন

কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর আরবের রাজনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) পুরোমাত্রায় অবহিত ছিলেন। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তিনি তাঁর প্রখর দিব্যদৃষ্টিতে আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নবজাগরণে নেতৃত্বদানকারীদের নৈতিকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণাপ্রাপ্ত ছিলেন। সুগভীর চিন্তাভাবনার পর তিনি এ ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন যে, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী পারস্য-রোমান সম্রাটদের মতো স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় মানবাধিকার এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সময়কালে সৃষ্ট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভূলুন্ঠিত হয়ে পড়েছে। রোমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রভাবিত আমীর মুয়াবিয়া প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক রাজতন্ত্রের প্রতি সিরিয়বাসীর ঐক্যবদ্ধভাবে আনুগত্য প্রকাশ মূলতঃ আরব জাতির মধ্যে নানামুখি চিন্তা-চেতনা এবং দলাদলির সূত্রপাত ঘটায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নৈতিকতা, আদর্শবাদিতার পরিবর্তে কুটনীতি, শঠতা, ধূর্ততা, ক্ষমতা লিপ্সা এবং জনঅধিকার হরণের প্রবণতা তীব্র আকার ধারণ করে। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় খলিফাদের ধার্মিকতা, আদর্শবাদীতা, জনসেবকের ভূমিকার কারণে খিলাফত ছিল আল্লাহ্‌র পালনবাদী নীতি তথা রবুবিয়তের পরিপূর্ণ আদর্শে সমৃদ্ধ। ধার্মিক খলিফাবৃন্দ কখনো নিজেদেরকে জনসেবকের ঊর্ধ্বে ভাবেননি এবং কখনো অযাচিত কর্তৃত্বপ্রবণ কার্যব্যবস্থাও চালু করেননি। ফলে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন রাজ্যের জনগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনন্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে পারস্যসহ অন্যান্য দেশগুলোতে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতিরোধমুখি অভিযান শুরু হলে সাধারণ মানুষ বিশেষত অবহেলিত, দুঃস্থ, অধিকার বঞ্চিতদের ব্যাপক নৈতিক সমর্থন মুসলিম অভিযাত্রীরা প্রাপ্ত হন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিবর্তে রাজতন্ত্র চালু হলে ইসলাম

ধর্মের মৌলিক চেতনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতিকে ইহজাগতিক ধারা এবং ইবাদত-উপাসনাকে পারলৌকিক বিষয় হিসেবে চালু করা হয়। এ ধারা মূলতঃ যিশু খ্রিস্টের পরবর্তী খ্রিস্টান ধর্মাচারীদের বিশ্বাস এবং নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ স্তরের খ্রিস্টান ধর্মমতে, "সীজারের কাজ সীজারকে করতে দাও, আর পোপের কাজ পোপ করবে।" এ ধারণায় মানবজীবন পার্থিববাদ এবং পারলৌকিক ধারায় বিভক্ত হয়ে পার্থিববাদে অনৈতিকতা, শঠতা, দাম্ভিকতা, ভ্রষ্টতা, মিথ্যা, অশিষ্টাচার, অসততা প্রভৃতিকে নীতি হিসেবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার অন্যায্য অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ধর্মকে শুধু গীর্জার চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা উপর্যুক্ত নীতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। অথচ ইসলাম পার্থিব জীবন এবং পারলৌকিক জীবনকে অভিন্ন গতিতে পালন করার নির্দেশনা দিয়েছে। কারণ পবিত্র কোরআনের অগণিত বাণী প্রবাহের পাশাপাশি হাদিস শরিফে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "ইহকাল পরকালের কৃষিক্ষেত্র।" সিরিয়াবাসীদের সমর্থনে আমীর মুয়াবিয়া নির্দেশিত পন্থায় রাজতন্ত্র চালু হলে একমাত্র হযরত উমর বিন আবদুল আজিজ ব্যতীত সকল উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসকরা ইসলাম ধর্মের শাশ্বত-মৌলিক প্রবাহকে অবজ্ঞা করে সীজার প্রথা চালু রেখেছেন। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নিকট উপর্যুক্ত তথ্যচিত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। তাই তিনি এক পারিবারিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে আরেক পারিবারিক রাজতন্ত্রের অভ্যর্থনা জানানোকে বাস্তব সম্মত মনে করেননি।

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পবিত্রতম বংশের প্রতিভাবান সদস্য এবং ঐশী জলোয়ার গোপন ভাণ্ডার "বেলায়তের" দায়িত্বপ্রাপ্ত হেফাজতকারী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বত্র নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এমতাবস্থায় হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাতের প্রতিক্রিয়ায় সর্বত্র সৃষ্ট গণবিস্ফোরণ রক্তপাতের দিকে অগ্রসর হলে মুসলিম উম্মাহ্ নানামুখি নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে যাবে। এর ফলে রোমানদের আগ্রাসন, পারস্যে মাজুসীদের পুনরুত্থান এবং তাওহীদ বিরোধী বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সন্ত্রাস এবং সামরিক অভিযান চালিয়ে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্বই বিপন্ন করবে। সুতরাং উগ্রপন্থা নয় বরং ধৈর্য এবং সহনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো উম্মাহ্র স্বার্থে জরুরী এবং বাস্তবসম্মত কাজ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মদিনা শরিফে নীরবে, নিভৃতে, ইবাদতের একাগ্রতায় নিমগ্ন থাকা কালে তিনি জনবিচ্ছিন্ন উপাসক ছিলেন না। নির্জনে একাকী আরাধনা করা অবস্থায় অসংখ্য মানুষ হেদায়েতের পথ-নির্দেশ প্রাপ্তির আশায় তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন। প্রতিদিন

অসংখ্য জনস্রোত তাঁর সমীপে সত্যপথ প্রাপ্তির আশায় আসতেন। তাঁদের অনেকে ছিলেন শাসকের নির্যাতনে অতিষ্ঠ নিপীড়িত মজলুম। তিনি নিজেকে মজলুম পরিচয় দিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্‌র সহায়তা কামনা করার পরামর্শ দিতেন। তাঁদের অভিযোগ-অনুযোগ ছিল বিভিন্নমুখি। দামেস্কের স্বৈররাজতন্ত্রের পাশাপাশি কারবালার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট গণবিস্ফোরণের নেতাদের আচার, আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জনগণের চিন্তাধারা এবং মানসিকতা সম্পর্কে তিনি অবহিত হতেন। তিনি কারবালার প্রতিক্রিয়ায় নেতাদের ক্ষমতার লোভ, একশ্রেণীর নেতা এবং মানুষের ক্রমহ্রাসমান নৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত ছিলেন যে, মদিনা, বসরা, কুফা, মক্কায় যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা মূলতঃ কারবালার ঘটনাপ্রবাহকে উপলক্ষ্য করে ক্ষমতাসীন হবার চেষ্টায় রত আছেন। তাই তিনি কারবালার মহান শহীদানদের পরম কোরবানী এবং শোণিত প্রবাহকে ক্ষমতা লিপ্সার অপজাতে অপদস্থ করতে রাজী ছিলেন না।

আরবের তৎকালীন বাস্তব অবস্থা দেখে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) রক্তপাত পরিহার করে ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা এবং সহজ সরল জীবন পদ্ধতিকে সর্বজনীনভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতে সামাজিক এবং মানসিক সংস্কারের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিশ্বনবি (দ.) এর পবিত্রতম জীবনধারা অনুশীলনে গড়ে ওঠা সাহাবা চরিত্র এখন মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে অবশিষ্ট নেই। সুতরাং উন্নত নৈতিকমান গড়ে তোলা ব্যতীত ইসলাম ধর্মের সামাজিক ভিত্তি মজবুত রাখা সম্ভব নয়। তাই তিনি উম্মাহ্‌র নৈতিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন জনগণের সংগ্রামের পথ এবং অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলনকে কখনো ভুল পথ মনে করতেন না। তবে তিনি মনে করতেন সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন আত্মবিমুখ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাওহিদী সৈনিক– যা হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) মধ্যে পরম ধারায় বিকশিত হয়েছিল। তরুণ বয়সে তিনি তাঁর মহান পিতাকে অন্তরঙ্গভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মহান পিতার অতুলনীয় সাহস, আদর্শনিষ্ঠা, সত্যপ্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার, সুউচ্চ নৈতিকমান, জনঅধিকার আদায়ে আপোষহীন চারিত্রিক সৌন্দর্য তাঁকে সবসময় প্রেরণাদীপ্ত রাখতো। এ জন্য তিনি পিতার মতো সবকিছু উৎসর্গ করার মতো ব্যক্তিত্ব এবং কর্মীবাহিনী সৃষ্টিকে প্রাথমিক ও জরুরী পদক্ষেপ মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বিশ্বনবি (দ.)'র দ্বীন প্রচার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগপৎ সাফল্যের পিছনে ছিল সুউচ্চ নৈতিকমানে গড়ে ওঠা সাহাবাদের আত্মোৎসর্গের পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং অঙ্গীকার।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অনর্থ যুদ্ধ জঙ্গে জামাল এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে হযরত আলী (রা.)'র প্রতিপক্ষ হিসেবে আমীর মুয়াবিয়ার ক্ষমতা দখলের কারণে সংঘটিত বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ, হযরত ইমাম হাসান (রা.) কে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিষপ্রয়োগে শহীদ করার ঘটনা, কারবালার ভয়াবহ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী, উমাইয়া রাজত্বের প্রতি সিরিয়াবাসীর আনুগত্য, কুফার জনগণের অস্থির কার্যকলাপ এবং কপটতা, পবিত্রস্থান মক্কা-মদিনার জনগণের নিষ্ক্রিয়ভাব এবং নীরবতা প্রভৃতি পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্বিক ধারণাপ্রাপ্ত ছিলেন। এ সকল ঘটনায় একশ্রেণির জনগণের সুবিধাবাদিতা, নৈতিকস্খলন পর্যবেক্ষণ করে কারবালা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় নেতৃত্বদান অথবা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা পালনে তিনি সম্পূর্ণ অনীহ এবং নীরব ছিলেন।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাতের বদলা নিতে কুফায় গড়ে ওঠা তাওয়াবীন আন্দোলন (হযরত আলী (রা.), হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), হযরত মুসলিম (রা.) প্রমুখের সঙ্গে বিভিন্নভাবে কপট আচরণ প্রদর্শন, ডেকে এনে পরবর্তীতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রচণ্ড নীরবতা পালনের জন্য তাওবা বা অনুশোচনাকারী দল) এবং মুখতার ছাকাফীর বিপ্লব কোনটিকেই তিনি সমর্থন দেননি। পিতৃহত্যার বদলার জন্যে রক্তপাতের পরিবর্তে তিনি সার্বজনীন মানসিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে নীরবে এবং ধীর স্থিরভাবে কাজ করতে সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আরবে চলমান তুমুল রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সময়ে তিনি একাগ্রচিত্তে আরাধনায় ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে মূলতঃ নীরবে নীরবে এক মানসিক বিপ্লব সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ বিপ্লবের ফলাফল আসে কিছুটা বিলম্বে এবং উমাইয়া বংশে উদিত তাসাউওফ সূর্য হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)'র মাধ্যমে।

মুখতার ছাকাফী নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে কারবালা ঘটনাপঞ্জীকে যখন ব্যবহার করছিলেন এবং হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে নিজের 'মুরুব্বী' বলে চালাচ্ছিলেন তখন তিনি মসজিদে নববির মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুখতার ছাকাফীর প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ জানান। লোকজনকে মুখতার ছাকাফীর চালাকি সম্পর্কে তিনি সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, তখন মদিনায় উমাইয়া শাসনের কোন চিহ্ন ছিলনা। সবকিছুই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.)'র সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মক্কা-মদিনায় হযরত ইবনে যুবাইর (রা.)'র পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকেও সমর্থন দেননি। কারণ এ ধরনের ক্ষমতা বদলে পবিত্রতম স্থান হেরেম শরিফ এবং মদিনা শরিফ সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল

অত্যধিক। তিনি নিজেকে এ ধরনের অপতৎপরতায় সামিল করতে চাননি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) কর্তৃক প্রখ্যাত সাহাবী এবং তাফসীরুল কোরআন বিশারদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত আলীর (রা.) পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করাকে অনৈতিক মনে করেছেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে ইবনে যুবায়েরের বায়াত স্বীকার না করায় কারাগারে রেখে নির্যাতন করাও তাঁর পক্ষে কখনো সমর্থনযোগ্য ঘটনা ছিল না।

আরবে এ ধরনের নানামুখী পরিবর্তন, সংঘাত-সংঘর্ষ-যুদ্ধ চলাকালে তাই তিনি নীরবতা পালন এবং জনারণ্যে বসবাস করে জনকোলাহল থেকে নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহ্‌র ধ্যানে একাগ্র থাকাকেই সর্বোত্তম কাজ হিসেবে লালন করেন। এ সময়ে তাসাওউফে দীক্ষা গ্রহণের জন্যে অসংখ্য মানুষ তাঁর বায়াত হন এবং আত্মার প্রসারণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাওহীদ প্রচারের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়া এ সকল ব্যক্তিরাই দুনিয়ার নানা স্থানে সুফি, দরবেশ, আউলিয়া নামে অতি সম্মানে বরিত হন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ইমাম যয়নুল আবেদীন কি সাহসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন না?

কারবালার মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা পরবর্তীতে নবিজী (দ.) এর বংশধারার নেতৃত্বে আসেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)। তরুণ বয়সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণের ফলে তিনি সর্বাবস্থায় নিজেকে সংযত, ধৈর্যশীল, ধীর স্থির এবং দূরদর্শী প্রমাণে সক্ষম হন। জালিম, প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ পরায়ণ উমাইয়া শাসকরা তাদের গোত্রীয় আধিপত্য অব্যাহত রাখার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে নবিজী (দ.) এর আহলে বাইতকে চিহ্নিত করে। তাদের আক্রমণের তাণ্ডবতায় নবিজীর (দ.) বংশ প্রায় বিধ্বস্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল। এ ধরনের বিপর্যয় থেকে নবিজী (দ.)'র বংশকে পরম ধৈর্য সহকারে টিকিয়ে রাখাই পারিবারিক কর্তা হিসেবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন, হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) মধ্যে পিতৃসাহস ছিল না। কারবালার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এ ধরনের তথ্যকে অসার প্রমাণ করেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ছিলেন বিশ্বনবি (দ.)'র পবিত্রতম শোণিতের ধারক। অকুতোভয় বীর, আল্লাহ্‌র যুলফিকার, জঙ্গে খায়বারের আলী হায়দার (রা.) ছিলেন তাঁর দাদা। কারবালা প্রান্তরে শেষ মুহূর্তে একাকী যুদ্ধ করে শত্রু পক্ষকে ছিন্নভিন্ন করার মতো বিরল সাহসী এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিবার পরিজন, জান-মাল উৎসর্গকারী হযরত ইমাম হোসাইনের অনন্য পুত্র হলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)। কারবালা প্রান্তরে প্রচণ্ড লড়াই চলাকালে তিনি ছিলেন ভীষণ অসুস্থ। এ সময় তিনি পীড়ার প্রতাপে কখনো কখনো সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। তবে তাঁর ভাই যখন কারবালা প্রান্তরে কোরবানী হলেন তখন অসুস্থ ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে গমনের জন্যে মহান পিতার নিকট বিনীত আর্জি

পেশ করেছিলেন। পিতা তাঁকে পীড়িত অবস্থায় যুদ্ধে না গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দেন এবং তাঁর পবিত্র হৃদয়ে বেলায়তের মহামূল্যবান খনি সমর্পণ করেন।

কারবালা যুদ্ধের পর জালিম ইবনে যিয়াদ সমীপে নীত হলে সেখানে তাঁর আচরণ ছিল নির্ভীক এবং সুস্থির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। ইবনে যিয়াদ যখন কথোপকথনের একপর্যায়ে কুফার রাজদরবারে তরুণ ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) কে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে হত্যার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় তখন তিনি যিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওহে যিয়াদের ছেলে! আমাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছ? তুমি কি জান না, শহীদ হওয়া আমাদের প্রথা ও শাহাদাত বরণ আমাদের মর্যাদা....।" দামেস্কে ইয়াজিদ সমীপে তাঁর কথোপকথন এবং ইয়াজিদ পুত্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের আহ্বানের প্রত্যুত্তরে দুজনের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের পক্ষে উদ্যোগ নেয়ার প্রস্তাব হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) অসীম সাহসিকতার প্রমাণ। দামেস্কের রাজকীয় মসজিদে ইয়াজিদের উপস্থিতিতে সমবেত মুসল্লিদের সম্মুখে দীর্ঘ খুত্‌বা প্রদান এবং আযানের জওয়াব প্রদানকালে ইয়াজিদকে লক্ষ্য করে বলিষ্ঠ ভাষায় যে রূঢ় সত্য কথা উচ্চারণ করেছিলেন তা তাঁর সাহসী ব্যক্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। সর্বোপরি ইয়াজিদের বায়াত প্রশ্নে তিনি তাঁর মহান পিতার সুউচ্চ আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেছেন, এমনকি মদিনা-মক্কায় রাজনৈতিক পালাবদলের সময় তিনি ইবনে যুবায়ের এর নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেননি।

মদিনা শরিফ আক্রমণকালে দানবীয় ভূমিকা পালনকারী মুসলিম বিন ওকবার নির্দেশে নির্জনে ইবাদত রত হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে গ্রেফতার করা হয়। ইয়াজিদ বাহিনী তাঁকে মুসলিম বিন ওকবার সম্মুখে উপস্থিত করে। রূঢ় স্বভাবের মুসলিম বিন ওকবা সৈনিকদের সম্মুখে যয়নুল আবেদীন (রা.) সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে এবং তাঁকে বর্বর ইবনে ওকবার সম্মুখে হাজির করতে নির্দেশ দেয়। বন্দী হিসেবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে হাজির করা হলে মুসলিম বিন ওকবা বিজয়ীসুলভ রুক্ষ মেজাজে, ভ্রষ্ট দাম্ভিকতা নিয়ে রূঢ় কণ্ঠে ইমাম সাহেবকে ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

এ ধরনের নির্মম সেনাপতি সমীপে তিনি অসীম সাহসিকতা নিয়ে বলেন, "ইয়াজিদ আমার নিকট হতে কিসের আনুগত্য প্রত্যাশা করে? কোন কথার উপর আমাকে তুমি শপথ করাতে চাও? এ সময় ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে দুর্ধর্ষ মুসলিম বিন ওকবার কণ্ঠস্বর শুকিয়ে যায় এবং এক অপার্থিব ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুসলিম কিছুটা পিছু হটে যায়। অবশেষে আমতা আমতা করে অত্যন্ত কোমল ভাষায় বলেন, না তেমন কিছু নয়, আপনি শুধু নিশ্চয়তা দিন যে, ইয়াজিদের একজন বিশ্বস্ত জ্ঞাতিভাই হিসেবে সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবেন।

এতটুকু কথা শেষ করে মুসলিম বিন ওকবা অতি সম্মানের সাথে ইমাম সাহেবকে বসতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে দুর্ধর্ষ মুসলিম বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে নির্দেশ করুন। আমি তা পূর্ণ করতে পারলে আনন্দিত হবো।" এ সময় হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। এই মুহূর্তে তুমি তরাবারি কোষবদ্ধ করো। মদিনাবাসীদের উপর আর নির্যাতন চালাবে না।"

ইমাম সাহেবের প্রস্তাব মুসলিম দ্রুত কার্যকর করে এবং সেনাবাহিনীকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে হত্যাযজ্ঞ এবং লুণ্ঠন বন্ধ করে দেয়। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে মুসলিম স্বীয় বাহিনীসহ মদিনা ত্যাগ করে মক্কার পথে রওনা দেয়।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মুসলিম বিন ওকবার নিকট থেকে চলে আসার পর সেখানে উপস্থিত ইয়াজিদের সভা সদস্যগণ মুসলিমকে ইমামের প্রতি তার আচার-ব্যবহারের হঠাৎ পরিবর্তনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যে, "আলী ইবনে হোসাইন (রা.)'র (ইমাম যয়নুল আবেদীন রা.) প্রতি তো তুমি খড়গহস্ত ছিলে, কিন্তু তাঁকে সামনে হাজির করার পর যে একেবারে পানি হয়ে গেলে– ব্যাপার কী?

মুসলিম জবাব দেয় যে, তাঁর চেহারার প্রতি দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার অন্তরে দারুণ কম্পন শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমি কেমন যেন সম্বিত হারা হয়ে যাই।"

উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ হচ্ছে চির অচঞ্চল-সংযত স্বভাবের ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র বীরত্ব ধারা।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভাগ্য বিপর্যয়কালে মদিনাবাসীদের আশ্রয় কেন্দ্র ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র আস্তানা

ইয়াজিদের নির্দেশে মুসলিম বিন ওকবা যখন পবিত্র মদিনা আক্রমণ করে তখন মদিনাবাসীদের চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের দিনে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর আস্তানা ছিল নির্যাতিত মানুষের একমাত্র আশ্রয় কেন্দ্র। আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীতে তাঁর বাসস্থানটি লুটেরা হিংস্র বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পেয়েছিল। তখন ইয়াজিদের দানবীয় বাহিনীর আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবার আশায় মদিনা শহরের শত শত নারী-শিশু ইমাম পরিবারের অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ইমামের অন্তঃপুর এবং আবাসস্থলে আশ্রয়প্রাপ্ত সকলের খাদ্য-পানীয়সহ সবকিছুর আয়োজন ইমাম যয়নুল আবেদীন নিজের হাতেই করতেন। লুণ্ঠিত শহরে নির্যাতিত, আহত গৃহহীন, সম্পদ-সম্বলহীন সর্বহারা মানুষের খেদমত করার জন্যে একমাত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর লোকজন নিয়ে ছুটাছুটি করতেন।

আর্ত-মানবতার সেবার পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে রওজা আকদসে'র পাশে বসে আল্লাহ্‌র দরবারে করুণ ফরিয়াদ পেশ করে বলতেন, "হে মহান পরওয়ারদিগার! আপনি সর্বশক্তিমান, আপনি অসীম মেহেরবান, এ শহরে আপনার প্রিয়তম নবিকে মক্কাবাসীর অত্যাচার, অনাচার এবং হত্যাপরিকল্পনা থেকে রক্ষা করে আপনিই আশ্রয় দিয়েছেন, নির্যাতিত সাহাবায়ে কেরাম এ শহরেই আশ্রয় গ্রহণ করে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্ব নবি (দ.) এর একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত উম্মত হিসেবে দীন ইসলামের ঝান্ডা উত্তোলন করে বিশ্বময় হেদায়তের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাওহীদের অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত রেখে পৃথিবীবাসীর নিকট ছড়িয়ে দিয়েছেন, মুশরিক-মুনাফিক এবং তাওহীদ বিরোধী বীভৎস হায়েনারা যে শহরকে আক্রমণ করতে এসে বার বার পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হয়েছে, সে শহরের বাসিন্দারা আজ চরম লাঞ্ছনা এবং

বিপর্যয়ের শিকার। মদিনা শহরে চলমান বিভীষিকার হাত থেকে আত্মরক্ষা কল্পে আপনার কিছু সংখ্যক বান্দাকে আপনিই এখানে আশ্রয় দিয়ে হেফাজতে রেখেছেন। আমার বিনীত আর্জি আপনি তাদের এ সামান্য আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নেবেন না। মাওলা! এখন পবিত্র মদিনায় যা কিছু হচ্ছে 'ছামীউন বসির' হিসেবে আপনি সবই দেখছেন, শুনছেন, আপনার অজানা কিছুই নেই। আপনার 'শরীফুল আকলামে' লিখা ভাগ্যলিপি কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার ফয়সালার বাইরে কোন কিছু হবার উপায় নেই। আপনি এখানে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষগুলোর উপর রহম করুন।" মদিনা শরিফের বিপর্যস্ত অবস্থাকালে মহান করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র পবিত্র দুটি হাতই ছিল রহমত প্রাপ্তির প্রধান অস্ত্র। তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল রাব্বুল আলামীনের উপর একান্ত ভরসা। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এতোই মেহেরবান ছিলেন যে, কখনো তাঁর উত্তোলিত পবিত্র হাত দুটিকে ফিরিয়ে দেননি। তাঁর আকুল ফরিয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে মদিনাবাসীদের অনেকেই মুসলিম বিন ওকবার জুলুম থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে কারবালা হত্যাযজ্ঞের বিভৎস নায়ক ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের প্রায় সকলেই মুখতার ছাকাফীর নির্দেশে নিহত হয়। কুফার দুঃশাসক দুর্বৃত্ত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হলে তার শিরশ্ছেদ করে কুফায় অবস্থানরত মুখতার ছাকাফী সমীপে পেশ করা হয়। মুখতার ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির পবিত্র মদিনায় বসবাসরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নিকট পাঠিয়ে দেন। ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির নিয়ে যখন মুখতার ছাকাফীর প্রতিনিধি ইমাম সাহেব সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি মদিনাবাসীদের বিপুল সংখ্যক জ্ঞানীগুণীসহ দস্তরখানে বসে খাবার গ্রহণ করছেন। মুখতারের দূত যখন কর্তিত শির ইমাম সাহেবের সামনে রাখেন তখন তিনি বেশকিছু সময় অন্যমনস্ক হয়ে অতীত দৃশ্য স্মরণ করে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর মনে পড়ে যায় নৃশংস ঘটনাবলীর দৃশ্য। তাঁর চোখের সামনে সবই ভেসে উঠে। দশ মহর্‌রম যখন হযরত ইমাম হোসাইনকে (রা.) শহীদ করা হয় তখন তাঁর পবিত্র শির নিয়ে নবিজী পরিবারের সকল মহিলা সদস্যসহ অসুস্থ-রুগ্ন একমাত্র পুরুষ সদস্য ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে সিমার এবং তার দুর্বৃত্ত সহচররা ইবনে যিয়াদ সমীপে উপস্থিত হয়। এ সময় ইবনে যিয়াদ তার সভাসদ এবং সহচরদের নিয়ে মহাউল্লাসে দস্তরখানে বসে খাবার গ্রহণ করছে।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর নির্মম ঘাতকদের এ ধরনের উল্লাস দেখে প্রবল মনোবেদনায় আহত নিতান্ত তরুণ হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র চিত্তে একটি আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। প্রচণ্ড আবেগ এবং ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে তখন তিনি মহান পরওয়ারদিগার সমীপে কামনা করেছিলেন, "আয় আল্লাহ্! এমন দিন কি কখনো

আসবে, যখন এভাবেই আমি বন্ধু বান্ধবসহ খাবার গ্রহণের জন্যে দস্তরখানে বসব এবং ঠিক এ সময়ে দুরাত্মা ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির কেউ এনে আমার সামনে উপস্থিত করবে।" কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থেকে তিনি দস্তরখান থেকে উঠে পড়েন। উপস্থিত সকলে দেখলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র দুচোখ দিয়ে অবারিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

এ ধরনের নীরব কান্নার মধ্যে কিছুটা দূরে সরে তিনি সিজদায় পড়ে যান। মহান আল্লাহ্ পাক-এর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করে সিজদারত অবস্থায় তরুণ বয়সে এ ধরনের একটি কঠিন আকাঙ্ক্ষার জন্যে লজ্জিত হয়ে গাফুরুর রহীম আল্লাহ্র নিকট পরম বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণ তরুণ বয়সের আবেগপ্রবণ কামনা একটু পরিণত বয়সে কখনো কাম্য নয় বলে তাঁর ধারণা। এ ছাড়া বেলায়তের অত্যুজ্জল প্রদীপ যাঁর হৃদয়ে সর্বক্ষণ নিত্য নতুনভাবে নূরের অজস্রধারা সৃষ্টি করে চলেছে সেই মহত্তম হৃদয়ে কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ প্রবণতা, অভিযোগ-অনুযোগ শত্রুতা থাকে না। বেলায়তের আলোতে আলোকিত এ অন্তর তখন অনন্ত অসীম এককসত্তা মহান আল্লাহ্র পবিত্র আবাসনে পরিণত হয়। তখন ইষ্ট-মিত্র-শত্রু ভেদাভেদ থাকে না। মানুষ এবং সকল সৃষ্টির প্রতি প্রবাহিত হয় পবিত্র ইহ্সান তথা কল্যাণ ধারা। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) স্বীয় দস্তরখানে ইবনে যিয়াদের কর্তিত শির দেখে তাই ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ এটিই হচ্ছে নবুয়ত এবং বেলায়তের প্রকৃত রূপ।

ইবনে যিয়াদসহ কারবালা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্তদের বিরুদ্ধে মুখতার ছাকাফীর নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিঘাত চলাকালে অনেকে প্রাণ ভয়ে কুফা বসরা ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন আশ্রয় নেয় হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র মদিনাস্থ বাসগৃহে। ইমাম যয়নুল আবেদীন উক্ত ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝে উঠার সুযোগ না দিয়ে যথাযথভাবে আদর-আপ্যায়ন এবং স্বস্তিত্বে থাকার ব্যবস্থা করেন। ইমাম সাহেবের সমাদর পর্যবেক্ষণ করে উক্ত ব্যক্তি হতবাক ও বিস্মত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে অভিমত পেশ করে জানায় যে, ইমাম সাহেব হয়তো তার সম্পর্কে জানেন না এবং তাকে চিনেন না। উক্ত ব্যক্তির অভিমতের জবাবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) জানান যে, তিনি তাকে ভালো করেই জানেন এবং চিনেন। কারবালা প্রান্তরে সে ইমাম পরিবারের শুধু অস্ত্রধারী প্রতিপক্ষ নয়, বরং সৈয়দ্যুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সহ শহীদানদের জঘন্য হত্যাকারীদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম একজন। সবকিছু জানা সত্ত্বেও আশ্রয় প্রার্থীর প্রতি কোন প্রকার প্রতিহিংসা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শনকে ইসলাম ধর্ম কখনো

সমর্থন করে না। উক্ত ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে তার যথাযথ নিরাপত্তা এবং সমাদর করার নাম ইসলাম। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং তাঁর পূর্ব পুরুষরা উপর্যুক্ত আদল সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। উল্লেখ্য যে কারবালার হৃদয় বিদারক দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অবলোকনকারী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এতো বেশি বিমর্ষ ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন চিন্তাক্লিষ্ট, বিষাদগ্রস্ত। অবশিষ্ট জীবনে তার মলিন মুখে কখনো হাসি দেখা যায় নি।

ঊনবিংশ অধ্যায়

হক্কুল ইবাদ তথা মানব সেবায় ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

ইয়াজিদ বাহিনীর প্রধান মুসলিম বিন ওকবার নির্দেশে মদিনার ঘরে ঘরে লুণ্ঠন, নারীর সতীত্ব হরণ ও নির্যাতন এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের ফলে সর্বত্র হাহাকার, সবাই মজলুম, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই সর্বহারা হয়ে গৃহহীন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে। এসময়ে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) জীবন সাধনার অন্যতম ক্ষেত্রে হক্কুল ইবাদ সম্পন্ন করাকে প্রধান ইবাদত হিসেবে গণ্য করেন। মদিনা লুণ্ঠনে এরূপ অবস্থা দাঁড়ায় যে, অনেক সুখী-সম্ভ্রান্ত-ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং পরিবার সব হারিয়ে নিঃস্ব পথের কাঙ্গালে পরিণত হয়। এমন দুর্দিনে মহাত্মা ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সকলের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে মানবসেবাকে সংযুক্ত করেন। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও স্মরণের পাশাপাশি আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণ সাধন– তাসাওউফ সাধনার অনিবার্য শর্তটি তিনি জনসম্মুখে নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করেন।

মদিনাবাসীর চরম দুর্দিনে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র গৃহদ্বার সকলের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়। ফলে খাবারের সময় হলে অগণিত মানুষ পাতানো রাখা দস্তরখানে এসে শরিক হতেন। যাঁরা আসতে দ্বিধা সংকোচ করতেন তাদের বাড়িতে তিনি নিয়মিত খাবার পৌঁছে দিতেন। পর্দানশীন মহিলা, স্বামীহারা বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুরা যাতে অনাহারে কষ্ট না পায় সে জন্যে তিনি রাতের অন্ধকারে তাদের দ্বারে দ্বারে নিজে গমন করে সাহায্য সামগ্রী পৌঁছিয়ে আসতেন। অন্ধকার রাতে নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের দুয়ারে কোন্ মহান ব্যক্তি সাহায্য সামগ্রী দিয়ে আসতেন তা জানার কোন উপায় কারো ছিলনা। মানব সেবায় নিজের গোপনীয়তা সংরক্ষণের জন্যে চাদরে মুখ ঢেকে রেখে তিনি সাহায্য সামগ্রী দিয়ে আসতেন। তাঁর এ ধরনের

গোপন সাহায্য গোপন ইবাদতের মতোই ছিল। ফলে তাঁর আত্মীয় স্বজনও এ ঘটনা অবহিত হননি। আত্মীয় স্বজন পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করত, যয়নুল আবেদীন আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে সাহায্য না করলেও রাতের আঁধারে আল্লাহ্র এক বান্দা এসে প্রচুর সাহায্য করে যাচ্ছেন। অবশ্য পরে কারো কারো নিকট বিষয়টি জানা হয়ে যায়।

মদিনা লুণ্ঠনের সময় নিয়মিত সেবাকর্ম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে তিনি ঋণগ্রস্ত, রুগ্ন এবং সাময়িকভাবে বিপন্ন লোকদের সেবায় অতিসংগোপনে পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর এ ধরনের কর্মকাণ্ড এবং মানবসেবা লক্ষ্য করে মদিনাবাসীর বিশ্বাস জন্মে যে, ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মদিনার সকল ব্যক্তি এবং পরিবারের অবস্থা অলৌকিকভাবে জ্ঞাত আছেন, তাই তিনি যখন যার প্রয়োজন তার কাছে সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়ে দেন। বিশ্বনবি (দ.)'র আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ধারণ করে তিনি মদিনায় আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা, এতিম এবং দুস্থের অভিভাবক হিসেবে অভয়বাণী নিয়ে তাসাওউফ সাধনায় একাগ্রতার পাশাপাশি মানব সেবায়ও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তখনো জীবিত ছিলেন তাঁদেরকে তিনি প্রায়ই দেখতে যেতেন। সাহাবীদের পুত্র-কন্যাদের খোঁজখবরও তিনি নিয়মিতভাবে নিতেন এবং সাহায্য-সামগ্রী প্রেরণ করতেন। তাঁর সেবা তৎপরতায় সকলের মধ্যে দৃঢ় আস্থা জন্মেছিল যে, ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) যেন তাদের পরিবারেরই একজন সদস্য।

মুহাম্মদ ইবনে উসামা বিন যায়েদ (রা.) এর শয্যাপাশে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)

সাহাবীদের নিয়মিত খবরাখবর সংগ্রহকালে একদিন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত মুহাম্মদ ইবনে উসামা বিন যায়েদ (রা.) কঠিন রোগাক্রান্ত। হযরত মুহাম্মদ ইবনে উসামা বিন যায়েদ (রা.) হলেন বিশ্বনবি (দ.) এর দত্তক পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারিসার (রা.) সুযোগ্য পৌত্র। হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) মুতার যুদ্ধে সেনাপতিত্ব কালে শত্রুর আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। বিশ্বনবি (দ.) বেচাল প্রাপ্তির পূর্বে সিরিয়া অভিযান পরিচালনার জন্যে উসামা বিন যায়েদকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ দেন। বিশ্বনবি (দ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে সংবাদ পান যে, বিশ্বনবি (দ.) কঠিন পীড়াগ্রস্ত। এ ধরনের দুঃসংবাদ অবহিত হয়ে তিনি অভিযান স্থগিত রেখে মদিনায় ফিরে আসেন। বিশ্বনবি (দ.)'র বেচালের পর খলিফাতুর রাসুল হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় হযরত

উসামাকে (রা.) প্রধান সেনাপতি করে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। প্রধান প্রধান সাহাবায়ে কেরাম সিরিয়া অভিযানে তাঁর অধীনে রণক্ষেত্রে অংশ নেন। তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ জয় করে সিরিয়া মদিনা সাধারণতন্ত্রের অধিভুক্ত হয়।

বীর সাহাবী হযরত উসামা (রা.)'র পুত্র মুহাম্মদ বিন উসামার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হন। মুহাম্মদ বিন উসামা (রা.) ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে দেখে ক্রন্দন করতে থাকেন। অবস্থা দেখে ইমাম সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "মৃত্যু দেখে কি আপনি ভয় পেয়েছেন? প্রত্যুত্তরে মুহাম্মদ বিন উসামা জানান মৃত্যুর ভয় নয়, বরং ঋণের বোঝা থাকায় দুঃচিন্তাগ্রস্ত আছি এবং বার বার কান্না আসছে। অসহায় দরিদ্র পরিবার পরিজনের এ ধরনের ঋণের বোঝা পরিশোধের সামর্থ নেই। ইমাম সাহেব তাঁকে ঋণের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে মুহাম্মদ বিন উসামা জানান, "পনের হাজার দীনার।" তিনি মুহাম্মদ বিন উসামাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আপনার সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করব।" উক্ত পীড়াতে মুহাম্মদ বিন উসামা ইন্তিকাল করেন। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে ঋণমুক্ত করেন। এভাবে ঋণগ্রস্ত, এতিম, বিধবা, রুগ্ন, বিপদগ্রস্ত মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে তিনি মুক্তহস্তে অনেকের ঋণ পরিশোধ করেন। আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তিনি অসুবিধা দূর করে অনেক দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.)'র মজলিসে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

জ্ঞান সাধনার লক্ষ্যে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কুলীন-অকুলীন ভেদাভেদ করতেন না। তিনি হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খাদেম আসলাম (রা.) এর মজলিসে নিঃসংকোচে উপস্থিত হতেন। হযরত আসলামের পুত্র যায়েদ ইবনে আসলাম ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী তাবেয়ী। তিনি মসজিদে নববিতে শিক্ষা দান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। দাস জীবন থেকে মুক্ত হবার পর তিনি জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সুগভীর। তরুণ বয়সে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অধিকাংশ সময় তাঁর মজলিসে শরিক হয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। যায়েদ বিন আসলাম সমীপে উপস্থিত হয়ে জ্ঞান চর্চারত দেখে নাফে বিন যুবাইর নামক জনৈক অভিজাত কুরাইশী যুবক অনেকাংশে ভর্ৎসনা সহকারে বলেন, "আশ্চর্যের বিষয়! আপনি সৈয়দজাদা, দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা অভিজাত ঘরের সন্তান। এতদসত্ত্বেও একজন ক্রীতদাসের নিকট

লেখাপড়া করতে যান।” প্রত্যুত্তরে ইমাম যয়নুল আবেদীন জানান– নাফে! ইলমের সুনির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই। ইলম শুধু সাধকের অন্তরেই স্থান লাভ করে থাকে। যায়েদ ইবনে আসলাম একজন সাধক পুরুষ। তিনি যা জানেন তা আয়ত্ত করতে হলে তাঁর নিকট অবশ্যই হাজির হতে হবে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বিশ্বনবি (দ.)-এর মহান বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, “মানুষের মর্যাদা একমাত্র জ্ঞানে ও খোদাভীরুতায়– রক্ত বা বংশ কৌলিন্যে নয়।”

বিংশ অধ্যায়

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

ইসলাম সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব, মানব মর্যাদা এবং মানবাধিকারের ধর্ম হিসেবে বিশ্বনবি (দ.)'র জমানা থেকে প্রচারিত এবং প্রয়োগ হওয়ায় তা খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত নির্দ্বিধায় অব্যাহত থাকে। উমাইয়াদের ক্ষমতা দখলের পর বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং ভেদনীতি প্রয়োগ হতে থাকে। আধুনিক ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম চার খলিফা তাঁদের কোন উত্তরাধিকার নিযুক্ত করেননি। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপার ছিল অনেকাংশে গণতান্ত্রিক এবং সাহাবায়ে কেরামের মতামত সাপেক্ষ বিষয়। আমীর মুয়াবিয়া এ নিয়ম ভঙ্গ করেন। এর পূর্বেও সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালে তাঁর চাল-চিত্র সম্পর্কে ইবনে খালদুন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চল এবং প্রদেশ পরিদর্শন এবং শাসক ও জনগণের সম্পর্ক বিষয়ে সরাসরি জ্ঞাত হবার জন্যে হযরত উমর ফারুক (রা.) স্বয়ং অতি নগণ্য বেশভূষায় গমন করতেন। একবার তিনি সিরিয়া পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, ইবনে খালদুনের মতে, "হযরত উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) যখন সিরিয়া উপস্থিত হয়ে আমীর মুয়াবিয়াকে রাজশক্তি সুলভ বৈভব ও ভূষণ এবং সভাসদ ও অনুষদের মধ্যে দেখতে পেলেন তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, এসব কি পারস্য রাজের বেশভূষা নহে, হে মুয়াবিয়া? হযরত উমর (রা.) পারস্যরাজ সুলভ বেশভূষা বলতে পারস্য সম্রাটগণের মিথ্যাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং রাজকীয় ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ধর্মহীনতার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন"– (আল মুকাদ্দিমা-ইবনে খালদুন, অনুবাদ গোলাম সামদানী কোরায়শী-পৃষ্ঠা-৩৭৯)।

আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে উমাইয়ারা ক্ষমতাসীন হবার পর ধীরে ধীরে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বোধ, মান-মর্যাদা, মানবাধিকার পরিত্যক্ত শব্দ সম্ভারে পরিণত হতে থাকে। উমাইয়া শাসনামলে আরব-অনারব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বিজিত অঞ্চলে

ইসলামের মূল্যবোধ ভিত্তিক সমাজকাঠামো গঠনের পরিবর্তে আরব জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অনারবদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ব্যতীত সকল উমাইয়া শাসক নিজেদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব অবাধ রাখার লক্ষ্যে অনারবদেরকে শুধুমাত্র পদাতিক বাহিনীতে নিয়োগ দিত। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনকালে অনারবদেরকে জিজিয়া এবং খারাজ দিতে বাধ্য করা হয়। অনারবরা আরবদের মতো নির্দিষ্ট ভাতা পেত না। পারস্যবাসীরা ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেও আরবদের মতো সুযোগ সুবিধা এবং ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে পারত না। এ কারণে ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে ইবনে হারুনের নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। **উমাইয়াদের বৈষম্য নীতির কারণে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া খারেজী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে। গড়ে ওঠে দাসপ্রথা নীতির বিরুদ্ধে মাওয়ালী আন্দোলন। কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাতের আবেগপ্রবণ ঘটনাকে সম্বল করে ক্ষীণ হয়ে পড়া শিয়া মযহাব নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ে তৎপর হয়ে ওঠে।** খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম সমাজজীবনে রোমান এবং পারস্য সমাজ-সংস্কৃতি ও আর্যবাদিতার প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মানুষে মানুষে বৈষম্য, বিদ্বেষ, জাত-বিজাতের দ্বন্দ্ব বেড়ে যেতে থাকে। তাকওয়ার পরিবর্তে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-প্রভাব প্রতিপত্তি মানব মর্যাদার মানদণ্ডের নিয়ামক হিসেবে কার্যকর হতে থাকে। এ ধরনের অপসংস্কৃতি এবং বৈষম্যবাদিতার পক্ষে একশ্রেণীর জ্ঞানীদের সমর্থন পরিলক্ষিত হতে থাকে। মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম, দাস-দাসী এবং তাদের সন্তানাদির প্রতি কথিত নব্য অভিজাত শ্রেণির লোকদের হেয় দৃষ্টি এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ ধরনের উৎকট সমাজধারা ভেঙ্গে দেয়ার লক্ষ্যে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) গোলাম-বাঁদী শ্রেণি থেকে আগত জ্ঞানী এবং পরহেযগার লোকদেরকে যথাযথ সম্মান দিতে নিজের পাশে বসাতেন। ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হতো। কারণ পবিত্রতম বংশধারা, রক্তের উত্তরাধিকার এবং আভিজাত্যে ইমাম যয়নুল আবেদীনের সমকক্ষ তখন পৃথিবীতে কেউ ছিলেন না। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কেউ তাঁর সমকক্ষও ছিলেন না। ফলে ইমাম সাহেব যাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন তা উপেক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সূচিত মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুগান্তকারী এক নীরব নৈতিক আন্দোলন।

দাসপ্রথা মানব সভ্যতা বিকাশের পথ উপশমের সম্ভাবনাহীন মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে বিদ্যমান বিষয়। ব্যবিলনের নগর সভ্যতা, মিসরের পিরামিড, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা প্রভৃতি কৃত্রিম সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে দাস-দাসীর কলিজার খুন, সবল হাতের কসরতে, পাঁজর ভাঙ্গা বিনা পারিশ্রমিকের মেহনত, শ্রমজীবী মানুষের ক্ষুধার জ্বালা এবং বাসগৃহের অভাবে করুণ আর্তনাদের বিনিময়ে। কথিত আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মূলেও রয়েছে দাসের মতো উপেক্ষিত-লাঞ্ছিত শ্রমিকের হাড়ভাঙ্গা শ্রম বিনিয়োগ। এ জন্যে আমেরিকার মতো দেশে দাস বিদ্রোহ হয়েছে, শ্রমিক অধিকারের দাবীতে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। দাসরা প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকায় তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছিল কৃত্রিম অভিজাত শ্রেণির একটি নেশা। দাস-দাসীরা জীবজন্তুর মতোই হাট বাজারে ক্রয় বিক্রয় হতো। পৃথিবীর দেশে দেশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসত 'দাসের হাট'। জন্মগতভাবে স্বাধীন মানব সন্তানকে দাসে পরিণত করার পন্থাগুলো ছিল অভিনব। যুদ্ধে পরাজিত গোত্র বা সম্প্রদায়ের লোকদের ধরে এনে দাস-দাসীতে পরিণত করা হতো। ধন-সম্পদ এবং শারীরিকভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বলীয়ানরা বন্য জন্তু শিকারের মতো দাস-দাসী সংগ্রহের জন্যে মানুষ শিকারে বের হতো। নানা কায়দায় শিশু অপহরণ করে দাসে পরিণত করে অর্থ উপার্জনের জন্যে বাজারে নেয়া হতো। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক আমীর-ওমরাহের ছেলেদের তথ্য আছে যাঁরা মূলত শাসক পরিবারের সদস্যভুক্ত ছিলেন, কিন্তু লুণ্ঠিত হয়ে দাস শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন। জীবন রক্ষার জন্যে পশুর মতো বরাদ্দকৃত খাবার ব্যতীত অন্যকোন অধিকার বা সুযোগ তাদের ছিল না। বরং বাল্যকালেই তাদেরকে গুরুত্বহীন ক্লীব গোষ্ঠীতে পরিণত করা হতো। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) সর্বপ্রথম দাসপ্রথা সমূলে উচ্ছেদের লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। দাসমুক্তির লক্ষ্যে তিনি ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদান করে সাহাবীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। দীর্ঘ সময় ধরে চলমান এ ধরনের কুপ্রথা অবসানের লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচিও ঘোষণা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম সমাজে গ্রীক, রোমান, পারস্যের মতো পুনরায় দাস-দাসী রাখার প্রবণতা বেড়ে যায়। বিজিত অঞ্চলের লোকদের ধরে বেঁধে এনে দাস-দাসীতে পরিণত করা খিলাফত পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীর একটি পেশায় পরিণত হয়। দাস-দাসীদের ভয়ে এবং আনাগোনায় পবিত্র মক্কা-মদিনার অলিগলিতে স্বাভাবিক চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। কোন উপায়ে বা অর্থের বিনিময়ে দাসরা মুক্তি পেলেও তাদেরকে গোলাম নামে অভিহিত করা হতো। তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ডাকা হতো 'গোলামের বাচ্চা' নামে। তারা সমাজে উপেক্ষিত পরগাছা শ্রেণিভুক্ত ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচার কালে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অনেক

ক্রীতদাসকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে স্বাধীন মানুষে পরিণত করেছিলেন। ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন এবং বিশ্বনবি (দ.)'র সার্বক্ষণিক সাথী হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন হাবসী ক্রীতদাস। বহিঃবিশ্বে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর প্রথম প্রধান সেনাপতি হযরত উসামা বিন যায়েদ ছিলেন ক্রীতদাস পুত্র। এ বাহিনীতে প্রথম দিকে হযরত সিদ্দিকে আকবর এবং হযরত ওমর ফারুক (রা.)'র মতো সমুজ্জল চরিত্রের নেতৃস্থানীয় সাহাবাও বিশ্বনবি (দ.)'র নির্দেশে সাধারণ সৈনিক মর্যাদায় যোগ দেন। অবশ্য বিশ্বনবি (দ.) এর বেচালের পর হযরত উমর (রা.) সৈনিক তালিকা ভুক্ত থাকলেও হযরত আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় বাদ পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) কে সহযোগিতা করার জন্যে প্রধান সেনাপতির অনুমতি নিয়েই হযরত উমর ফারুক (রা.) কে সিরিয়া অভিযান থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

বিশ্বনবি (দ.) কর্তৃক প্রবর্তিত এ নীতিমালা খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ায় জাহেলিয়াতের নতুন অভ্যুদয়ের প্রভাব পড়ে দাস-দাসীদের জীবন-মানে। বহিঃবিশ্বে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপক সাফল্য অর্জনের কারণে যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা বিপুলসংখ্যক বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধবন্দীরা দাস-দাসী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় আরবের সমাজ জীবনে তথাকথিত কৌলিন্যবাদ প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) লক্ষ্য করেন যে, সমাজে নতুনভাবে সৃষ্ট কথিত অভিজাত শ্রেণি হযরত বেলাল (রা.), হযরত শোয়াইব (রা.) (যিনি মূলত রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন), হযরত সালমান ফারসী (রা.)'র মতো সর্বস্বত্যাগী মহান সাহাবাদের সন্তান সন্ততিকেও দাস সন্তান হিসেবে উল্লেখ করে উপেক্ষিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এ ধরনের বর্বর প্রথায় উদ্বিগ্ন হয়ে দাসমুক্তি এবং সমাজ জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) জীবিকার জন্যে ব্যবসা করতেন। তাঁর ব্যবসায়িক কাফেলা নিয়মিত হেজাজ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত গমনাগমন করত। ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন হতো। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে আয়-উপার্জনও ভালো ছিল। এ ছাড়া আওলাদে রাসূল (দ.) হওয়ায় হাদীয়া নজরানা হিসেবে আশেক-ভক্তরা বিপুল অর্থ এবং দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করতেন। এ অর্থ তিনি প্রধানত জনসেবা, দুঃখী মানুষের সাহায্য সহযোগিতা এবং দাস-দাসী মুক্তির জন্যে খরচ করতেন। তিনি বিপুল সংখ্যক দাস-দাসী খরিদ করতেন। তাদেরকে ব্যবসা এবং কৃষিকাজে খাটাতেন। কাজের ফাঁকে এবং অবসরে তিনি তাদের লেখা পড়া শিক্ষা দিতেন। ইসলামী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই তিনি দাস-দাসীদের মুক্তি দিতেন। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীরা সমাজে সম্মানিতভাবে পুনর্বাসিত হচ্ছে কিনা সে

দিকেও সবসময় নজর রাখতেন। তিনি তাদেরকে নিজ পরিবারের সদস্যদের মতো মর্যাদা দিতেন। তাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন এবং সামাজিক আদান প্রদান করতেন। ইমাম পরিবারের 'মাওয়ালী' তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হওয়ায় তাদের সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যায়। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীদের উত্তম শিক্ষা দেয়ার কারণে তাদের মধ্যে অনেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধক পুরুষ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি মূলতঃ শিক্ষার ব্যাপারে আদর্শবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন।

মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সবসময় ফকির-মিসকিন এবং ক্রীতদাসের সঙ্গে বসে একই দস্তরখানে খাবার গ্রহণ করতেন। কোন গোলামকেই তিনি এক বৎসরের বেশি নিজের সেবায় রাখতেন না। প্রতি বৎসর রমজান মাসের শেষ দিকে তিনি দাস-দাসীদের মুক্তি দিতেন। ঈদের দিন থেকে যেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীরা স্বাধীন নাগরিক রূপে জীবন যাপন করতে পারে সে অনুযায়ী তাদেরকে অর্থ, সম্পদ এবং দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতেন। সাধারণত প্রচলিত সমাজে গোলাম বা ক্রীতদাসের অপরাধ অমার্জনীয় হতো। যে কোন অপরাধের শাস্তি হতো নির্মম ও কঠোর, এমনকি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) দাস-দাসীদের ছোটখাটো দোষক্রটি ক্ষমা করে দিতেন এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করে সংশোধনের পথ বাতলিয়ে দিতেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বিভিন্ন কাজে খাটার জন্যে অসংখ্য গোলাম-বাঁদী সংগ্রহ করতেন। খাতায় তাদের তালিকা থাকত। কেউ কোন অপরাধ করলে একে একে তা লিখে রাখা হতো। রমজান মাসের শেষ রাত্রিতে সমস্ত অপরাধীকে একে একে ইমাম সাহেব সমীপে হাজির করা হতো। তাদের সামনে অপরাধের তালিকা পাঠ করে শোনানো হতো। ইমাম সাহেব তাদেরকে অজু করে আসার নির্দেশ দিতেন এবং দু'রাকাত তওবার নামায আদায় করাতেন। তিনি তাদেরকে তওবা করার পর আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আহ্বান জানাতেন। আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা ভিক্ষার পর পর তিনি তাদেরকে অর্থ-সামগ্রী দিয়ে মুক্তি দিতেন।

এক পর্যায়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম-বাঁদী এবং তাদের সন্তান সন্ততির সংখ্যা অর্ধ লক্ষাধিকে পৌঁছে। এদেরকে সবাই ইমাম পরিবারের ওয়ালা বা আশ্রিত বলে বিবেচনা করতো। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রতি এদের এতো বেশি আনুগত্য এবং শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, তাঁর একটা অঙ্গুলি হেলনে তারা জীবন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না। অত্যন্ত বিস্ময়কর হলো যে, মুক্তিপ্রাপ্ত এ সকল

দাসদের মধ্য থেকে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সাহচর্যের গুণে অনেকে মোহাদ্দিস, ফকিহ্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। ইমাম যয়নুল আবেদীন কখনো এই স্তরের একটি সংগঠিত সামাজিক শক্তিকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহারের চিন্তাও করেননি।

মুসলিম সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করা তথাকথিত আভিজাত্য ভাঙ্গতে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীর সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর বিবাহ বন্ধন

উমাইয়া ঘরানার শাসক, আমীর-ওমরাহ এবং তাদের অনুগামী সুবিধাভোগী লোকেরা ইসলামের সাম্যবাদ এবং মানব মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামো বিনষ্ট করার লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে তথাকথিত কৌলিন্য বোধের প্রসার ঘটাতে তৎপরতা শুরু করে। তারা ইসলামী সমাজ দৃষ্টির পরিবর্তে রোমান এবং পারস্য সমাজদৃষ্টির আলোকে মানব বৈষম্যমূলক সমাজগঠনের জন্য নতুন নতুন অপসংস্কৃতি আমদানী করতে থাকে। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ইসলামী সমাজদৃষ্টির মধ্যে জাহেলিয়াতের নতুন নতুন হামলা ও আধিপত্য মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এ ধরনের নীরব বিপ্লবের নমুনা হলো একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁদীর সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। উমাইয়া কৌলিন্যবোধের দাপটের মধ্যে ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) এ পদক্ষেপ সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ আওলাদে রাসূলের (দ.) এ ধরনের সামাজিক পদক্ষেপ শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে বিব্রত অবস্থার সৃষ্টি করে। ইমাম সাহেবের এই পদক্ষেপ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-দাসীদেরকে উল্লসিত করে। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাশালী বংশের উত্তরাধিকারী কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্তা দাসী বিয়ে করাকে মাওয়ালীগণের সামাজিক মর্যাদাগত স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মূলতঃ নীরবে নীরবে এটি ছিল মানব বৈষম্য এবং জাত-বিজাতের কথিত কৌলিন্যবোধ ভাঙ্গার দৃঢ় পদক্ষেপ।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র বৈবাহিক সংবাদটি উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট পৌঁছে। এ সংবাদ প্রাপ্তির পর আবদুল মালিক অনেকটা শ্লেষাত্মক ভাষায় ইমাম সাহেব সমীপে নিম্নোক্ত পত্র লিখেন, "জানতে পারলাম আপনি নাকি সম্প্রতি একটি বাঁদীকে বিয়ে করেছেন। আপনার খান্দান কুরাইশকূলে কি এমন কোন মেয়ে ছিলনা যাকে বিয়ে করে আপনি আপনার ভবিষ্যত সন্তানদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারতেন। আপনি আপনার মর্যাদার প্রতি তো কোন খেয়ালই রাখলেন না। ভবিষ্যত বংশধরদিগকেও মর্যাদাহীন করে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।"

আবদুল মালিকের পত্রের জবাবে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) লিখেন, "আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁর পিয়ারা রাসুলের প্রতি দরুদ ও সালামবাদ। আপনার পত্র পেলাম। একজন মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁদীকে বিয়ে করায় আপনি আমাকে দোষারোপ করেছেন এবং আপনার ধারণা অনুযায়ী অভিজাত কুরাইশ খান্দানের কোন মেয়েকে বিয়ে করে আমার ভবিষ্যত বংশধরকে সম্মানিত করার প্রয়োজন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। স্মরণ রাখবেন! রাসুলে মকবুল (দ.)'র চাইতে বেশি ইজ্জত এ দুনিয়ার বুকে আর কারো হতে পারে না। পরবর্তী কালের মানুষ একমাত্র তাঁর দেখানো পথে চলেই প্রকৃত ইজ্জত লাভ করতে পারে। বাঁদীটি আমারই মালিকানাধীন ছিল। ওকে মুক্তি প্রদান করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই তাকে আমি বিয়ে করেছি। আল্লাহ্‌র দীন মোতাবেক এই কাজ কোন মুমিনের পক্ষে বিন্দুমাত্র ইজ্জত হানিকর হতে পারে বলে আমি মনে করি না। আল্লাহ্ তা'আলা বংশগত কৌলিন্যের অহমিকা খতম করে দিয়ে এরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে কোন আমল করার অভিযোগে কোন মুসলমানকে দোষারোপ করা উচিত নয়। যারা জাহেলিয়াতের যুগের পুরাতন এবং আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক বাতিল ঘোষিত ধ্যান-ধারণা পুনরায় জীবিত করতে চায়, তারাই ধিক্কার পাবার যোগ্য।"

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর পত্রের মাধ্যমে আবদুল মালিক সমীপে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ উন্মোচন করে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীকর্তৃক আমদানীকৃত কথিত আভিজাত্য এবং কৌলিন্যবোধকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

একবিংশ অধ্যায়

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)'র জীবনে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রভাব

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সৃষ্ট নীরব নৈতিক বিপ্লব হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইলম হাসিলের জন্যে মদিনার মসজিদে নববিতে অবস্থানকালে তিনি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এ সময় হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের মধ্যে নবিজী (দ.)'র আহলে বাইত এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি বিশেষ সম্মানজনক আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ধন-ভাণ্ডার এবং রাজকীয় আড়ম্বরে বড় হন। আরবে চরম বিলাসী যুবকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এর পরেও বাল্যকাল থেকে তিনি ধর্মীয় জ্ঞান এবং তাকওয়ার প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। পাঠ্য অবস্থায় মদিনায় অবস্থানকালে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র গভীর সান্নিধ্য এবং সংস্পর্শে তাঁর মধ্যে তাসাওউফ ধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর পরেও মদিনার গভর্নর পদে নিযুক্ত হলে তাঁর ব্যক্তিগত পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র ছিল ত্রিশটি উটের বোঝা। এ পদে থাকাকালে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সঙ্গে তাঁর নিয়মিত সংযোগ খুবই গভীর হয়। এ সম্পর্কের কারণে তাঁর জীবনাচারে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যে ব্যক্তি অতি উন্নতমানের পোশাককেও মোটা বলতেন উমাইয়া রাজত্বের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হবার পর তিনি সবচেয়ে মোটা কম্বলের কাপড়ই পরিধান করে শুকরিয়া আদায় করতেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে তাঁর অতি বিলাসী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফকিরী জীবনকে আলিঙ্গন করে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের মহত্তম খলিফাদের জীবনাচারে পুরোসময় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। মাতৃবংশের দিক থেকে

তিনি ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা.)'র শোণিতধারার উত্তরাধিকারী। তাই উমাইয়া রাজত্বকে তিনি পুরোমাত্রায় খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে সাজিয়ে নেন। এ জন্যে তাঁকে মহান দ্বিতীয় উমর হিসেবে সম্বোধন করা হয়। মুহাদ্দিস, ফকীহ্, অলী, দরবেশেরা তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো আদর্শ ধারার প্রতিনিধিত্বশীল খলিফা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁকে যুগের মোজাদ্দিদ হিসেবেও সম্মান দেয়া হয়। তাঁর এ ধরনের চরিত্র অর্জনের মূলে ছিলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)। তাঁর গভীর সংস্পর্শে থেকে ইবাদত বন্দেগী এবং আল্লাহ্ প্রেমের তালিম গ্রহণ করায় তিনি উমাইয়া রাজত্বে 'তাসাওউফের সূর্য' হিসেবে সম্মান অর্জনে সক্ষম হন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র একনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে আহলে বাইতের মর্যাদা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত হন। উমাইয়া শাসন আমলের শুরু থেকে রাজধানী দামেস্কসহ প্রত্যেক প্রদেশের গভর্নরবৃন্দ জুমা'র নামাযে খুত্বা প্রদানকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহান খলিফা, আহলে বাইত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নানাবিধ কুৎসা রটনা করে অভিসম্পাত প্রদান করত। তারা হযরত আলী (রা.) কে মন্দচারী বলতো। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের (রহ.) পিতা আবদুল আজিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিসরের গভর্নর থাকাকালে এ ধরনের খুত্বা দিতেন। পিতার মানসিক দুর্বলতা অনুধাবন করে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বিষয়টি সম্পর্কে পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন। পুত্রের প্রশ্নের জবাবে আবদুল আজিজ বিন মারওয়ান বলেন, "যারা আমাদের সমর্থক (উমাইয়া শাসন) তারা যদি হযরত আলী (রা.)'র মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে কেউই আমাদের সমর্থক থাকবে না। সকলেই হযরত আলীর (রা.) বংশধরদের অনুগামী হয়ে যাবে।" এ ছাড়া তিনি মদিনার অনেক মনীষী এবং তাকওয়াপন্থী ব্যক্তির নিকট হযরত আলীর (রা.) মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাওবা করেন। সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের পর শাসনভার তাঁর উপর ন্যস্ত হলে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনঃগঠন করেন। এ সময় তিনি খুত্বায় হযরত আলী (রা.)'র উপর অভিশাপ, মন্দাচারী এবং সমালোচনা বাদ দেয়ার জন্যে সর্বত্র হুকুমজারী করেন। ঐতিহাসিকদের মতে এটি তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে এ পদক্ষেপ সকল অলি-দরবেশ, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদের আন্তরিক দোয়া এবং সমর্থন লাভ করে। আল্লাহ্র মহিমা আহলে বাইতের প্রতি এতো অসীম যে বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে জুমার খুত্বায় আল্লাহ্র প্রশংসা, বিশ্বনবি (দ.)'র প্রতি অবিরত দরুদ ও সালাম পেশের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং আশরায়ে মোবাশশরার প্রতি সালাম পেশ করা হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং হিশাম ইবনে আবদুল মালিক প্রসঙ্গ

প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মালিক পরবর্তী শাসক হিসেবে তার পুত্র হিশামকে মনোনীত করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র তাঁকে পরিচিত করার লক্ষ্যে আবদুল মালিক স্বীয় পুত্র এবং উত্তরাধিকারীকে হজে প্রেরণ করেন। হিশাম হজে আগমনের কালে বিরাট লস্কর নিয়ে মক্কা শরিফে উপস্থিত হন। আবদুল মালিক মনোনীত পরবর্তী উমাইয়া শাসকের আগমনে মক্কায় সর্বত্র আমলা-কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিত্য নতুন ঠাট-বাট এবং হম্বি তম্বিতে জনগণ তটস্থ হয়ে পড়ে। তাওয়াফের পর বিশ্রাম গ্রহণের লক্ষ্যে তার জন্যে একটি মসনদও সাজিয়ে রাখা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র হেরেম শরিফ। এখানে রাজা-বাদশাহ্, উজীর, নাজির, ফকির-মিসকিন, দুঃখী-মজলুম সবারই অভিন্ন অধিকার এবং সম মর্যাদা রয়েছে।

হিশাম ইবনে আবদুল মালিক তাওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদ চুমো দেয়ার জন্যে অগ্রসর হন। রাজপুত্র হাজরে আসওয়াদে চুমো দেবেন– এ জন্যে ভীড় হালকা করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কে শুনে সরকারি নির্দেশ। সকলে উন্মাদ প্রায় হয়ে ঘিরে আছেন হাজরে আসওয়াদের কেন্দ্র। তখন এই পবিত্র স্থানে অবস্থানরত ছিলেন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)। তাঁকে ঘিরে একদল সাধক উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি দিয়ে এগুচ্ছেন। নবিজী (দ.)'র পবিত্র আওলাদকে দেখামাত্র লোকজন সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর চলাচলের জন্যে সকলে দ্রুত পথ করে দিচ্ছেন। তাওয়াফ শেষে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) যখন হাজরে আসওয়াদ চুমো দিতে অগ্রসর হন তখন প্রচণ্ড ভীড় মুহূর্তেই সরে গিয়ে তাঁকে যথাযথভাবে চুমো দেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। একজন লোকের প্রতি এতো শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন দেখে শাহী লোকজন হতভম্ব হয়ে যায়। তারা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র আগমন-নির্গমন

অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)’র প্রতি প্রচণ্ড আবেগভরা সশ্রদ্ধ ভালবাসা দেখে হিশাম অগত্যা তাওয়াফের স্থান ত্যাগ করে সুসজ্জিত মসনদে গিয়ে বসে পড়েন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে হিশাম ভাল করেই চিনেন। তাঁর প্রতি লোকের ভালবাসা এবং পরম শ্রদ্ধা বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল মালিক তাঁর সভাসদের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছিলেন, “মুসলিম দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ব্যক্তি তিনি (আবদুল মালিক) নন, সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হচ্ছেন মদিনার ফকির আলী ইবনে হোসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন রা.)। হজের সময় হেরেম শরিফে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) প্রতি জনগণের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং মর্যাদা লক্ষ্য করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান হিশাম। এ সম্পর্কে তাঁর সহচরগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হিশাম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং শ্লেষাত্মক ভাষায় বলেন, “কে জানে কোথাকার কে? আমার তাকে চিনতে হবে নাকি? এধরনের আলাপ চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমকালের আরবের প্রধান কবি আবুল ফিরাস ফেরাদাক। ইমামের প্রতি এ ধরনের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। চির নির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা আরব মরুর বেদুইন কবির কণ্ঠ থেকে তখন উচ্চারিত হলো কবিতার ঝাঁঝালো পংক্তি। তিনি বলে চললেন–

ওহে অন্ধ পাপিরা! তোমরা চিন না তারে!

যিনি সে মহান সত্তা যার পদক্ষেপ গুলো মক্কা চিনিতে পারে।
ইনি সে মহান পুরুষ, খোদ বাইতুল্লাহ্ জানে যাঁর পরিচয়
হেরেম ভূমির কোন বালুকণার কাছেও তাঁর কথা অবিদিত?

এ সময় জনগণ কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লাস মুখর পরিবেশে অনুরোধ করেন, আবু ফিরাস আরো বলুন, তখন কবি উচ্চারণ করেন–

ইনি জগতের সেরা মানুষের, সেরা ইমামের সন্তান
অন্তর যার পাপলেশহীন পুতঃপবিত্র মহান।
হৃদয় যাঁর সাগর আর ইলমের ভাণ্ডার
তাঁকেই চিনে না একথা যে বলে লজ্জা নাই কি তার?
যিনি পবিত্র কাবার হাতিমে-পাথর চুম্বন দিতে গেলে–
তাঁর পবিত্র সুরভিতে তারা উল্লাসে উঠে ছলে।
শালীনতায়, আভিজাত্যে তাঁর তুল্য কে আছে ভাই?
মানুষের সব সেরা গুণ শেষ এখানে আর কিছু বাকী নাই।

আবু ফিরাসের নির্ভীক কণ্ঠে কবিতা শুনতে তখন সেখানে দর্শক শ্রোতার প্রচণ্ড ভীড় জমে যায়। সমসাময়িক আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে আওলাদে রাসুল (দ.) সম্পর্কে উদ্দীপনাময় কবিতার পংক্তি শুনে পাগলপারা মানুষের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দাবী উঠে, প্রিয় আবু ফিরাস! আরো বলো, আরো বলো তুমি– নীরব হয়ো না,

আল্লাহ্র কসম! তিনি আবার শুরু করেন–

অজ্ঞ মুর্খেরা! এই মহৎ জনের পরিচয় এখনো না জেনে থাক
তবে আমি আজ বলি কথা সবে কান পেতে শুনে রাখ।
ইনি রাসূল দুহিতা ফাতিমার সুযোগ্য পুত্রের সন্তান
যার জনকের মাতামহ নবি রাসুলগণের সর্বশ্রেষ্ঠ জন।
শালীনতা ও বিনয়াধিক্যে সদাই দৃষ্টি আনত যাঁর
তবু তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলে, এমন শক্তি কার?
তাঁর পেশানীর হেদায়াতী নূর জাহেলী এমনি করে বিনাশ
যেমনি সূর্য নিজ আলো দ্বারা করে দেয় সব আঁধার নাশ।

হিশাম সম্মুখে জনগণের সাবাস! সাবাস! উচ্চারণ শুনে কবি বলে উঠেন–

সম্মান ও মর্যাদার এমন শিখরে অবস্থান তাঁর
আরব-অনারবের কোন ব্যক্তি সেই শীর্ষস্থানে আরোহণ করেনি আর।
তিনি এমন ব্যক্তি যাঁর নানা নবিদের সর্দার
যাঁর উম্মত সকল উম্মতের চেয়ে মর্যাদাবান আর
তুমিও উম্মত তাঁর॥
হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের জন্যে যখন তিনি অগ্রসর হন
সুগন্ধি পেয়ে হাজরে আসওয়াদ তাঁর সাথে করে করমর্দন ॥

নবি প্রেমের প্রচণ্ড আবেগের প্রাণবন্যা প্রবাহে উৎফুল্ল জনগণ দিক-বিদিক কলকল্লোলে মুখরিত করে আওয়াজ তোলে, অপূর্ব, হে আবু ফিরাস অপূর্ব!!

নির্ভীক কবি আবু ফিরাস ফারাযদাক ছিলেন হিশামের সভাকবি। হিশামের মুখে নবিজী (দ.) এর পরম সম্মানিত উত্তরাধিকারের প্রতি ঈর্ষান্বিত উক্তি শুনে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রবল ঈমানী জোশে আবু ফিরাসের কণ্ঠে কবিতার ভাব-ভাষা শুনে হিশামের সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। হিশাম সঙ্গে সঙ্গে ফারাযদাককে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী আসফান নামক স্থানে নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কবি আবু ফিরাস ফারাযদাক এর নির্ভীক এবং ঈমানের প্রতি অবিচলতার কথা শুনে খুবই প্রীত হন। তাঁর বন্দী দশার জন্যে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। নির্যাতিত ফারাযদাককে মানসিক সান্ত্বনা প্রদানের উপলক্ষ্যে ইমাম যয়নুল আবেদীন বার হাজার দিরহাম প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে তিনি ফারাযদাককে সম্বোধন করে সংবাদ দেন যে, "হে আবু কাবাশা! আমি অপারগ ও অভাবগ্রস্ত। এর চেয়ে বেশি দিরহাম থাকলেও তা আপনাকে দিতাম।"

কবি ফারাযদাক প্রথম দিকে এ অর্থ গ্রহণ করেননি। তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে অনুরোধসহ অর্থ ফেরৎ পাঠিয়ে জানান যে, "আমি পার্থিব কোন লোভ-লালসা ও মর্যাদা পাবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করিনি। বরং দীর্ঘ সময় হতে আজ পর্যন্ত বাদশাহের মিথ্যা প্রশংসা করে পাপের পাল্লা ভারী করেছি। দীর্ঘ সময়ে জালিম বাদশাহের প্রশংসা করে যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে আমি এ কাজ করেছি। আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাওয়া এবং রাসূল (দ.)'র পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এই অর্থ পুনরায় প্রেরণ করে সংবাদ দেন যে, "হে আবু কাবাশা! আপনি যদি সত্যিই নবি (দ.)'র পরিবারকে ভালবাসেন, তবে এটা গ্রহণ করেন। কেননা আমি এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজস্ব সম্পদ থেকে আপনাকে দান করেছি। এখন আমি তা ফিরিয়ে নিতে পারি না।" এ ধরনের সংবাদ পেয়ে কবি ফারাযদাক তা গ্রহণ করেন।

কবি ফারাযদাক ছিলেন মরুভূমির দামাল সন্তান ও জনপ্রিয় চারণ কবি। হাঁটা-চলাতেই তিনি কবিতা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। আরবের লোকেরা স্বভাবগতভাবে কাব্য রসিক ছিলেন। কবি ফারাযদাকের কবিতা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠে সমগ্র আরবে তা ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের কবিতা উমাইয়া শাসকের পীড়নে ভীত-শঙ্কিত জনগণের মধ্যে মানসিক সাহসের সঞ্চার করতে থাকে। ফলে উমাইয়া শাসকরা কঠিন হস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ধরনের কবিতা আবৃত্তির কারণে কবি ফারাযদাক যে কোন সময় দমন পীড়নের মুখে পতিত হবেন-এ রকম আশঙ্কা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) পূর্বেই করেছিলেন।

হজ শেষে অন্যান্যদের মতো কবি ফারাযদাক মদিনার পথে রওনা দেন। মক্কা থেকে দুই মঞ্জিল অগ্রসর হতেই কবি দেখলেন হিশামের সৈনিকরা রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে যাত্রীদের মধ্য থেকে কবি আবু ফিরাস ফারাযদাককে খুঁজছে। পথেই হিশামের সৈনিকদের হাতে কবি বন্দী হন। মরুভূমির দুরন্ত-দুঃসাহসী ছেলে কবি ফারাযদাক এ

ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বন্দী হয়ে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত শঙ্কিত হননি। বরং স্বীয় চিত্তকে শাণিত করে সৈনিকদের সম্মুখেই হিশামের নিন্দা সূচক কবিতা পাঠ করা শুরু করেন। এ কবিতায় তিনি উল্লেখ করেন,

"আমার আত্মা যখন পাক মদিনার ধুলিকণা
স্পর্শ করার জন্য উদ্বেল,
সেই মুহূর্তে আমাকে হেরেমে মক্কা এবং পাক মদিনার পথে বন্দী করেছ?
সেই পাক ভূমি, মানুষের অন্তর সে দিকে
ধাবিত হবার জন্যে পাগল হয়ে উঠে!
হিশামের মস্তিস্ক একজন নেতার মস্তিস্ক নয়।
বরং এর কটাচক্ষুর ভিতর হতে
সর্বদাই যেন অন্যায়ের অভিব্যক্তিই ফুটে
বের হতে থাকে।"

হিশাম হবেন দামেস্কের পরবর্তী বাদশাহ্। জনগণের মধ্যে তার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৈন্য-সামন্ত-নওকর-অনুচর এবং মোসাহেব পরিবেষ্টিত হয়ে পিতৃ নির্দেশে হজে গিয়েছেন। সভাকবি ফারাযদাককেও সঙ্গে নিয়েছিলেন স্তুতিবাক্য পরিবেশন করে জনসম্মুখে হিশামের ব্যক্তিত্ব প্রচারের লক্ষ্যে। কিন্তু বিধি বাম। হজে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর উপস্থিতির কারণে অজ্ঞাত-অখ্যাত থেকে হিশামকে কাবাগৃহের অদূরে বিশ্রাম নিতে হলো। আর সেখানেই চারণ কবির তীর্যক বাক্যে অপমান-অপদস্থ এবং পরিহাসের শিকার হলেন হিশাম। সে সময়কার মদিনার গভর্নর হিশামের নির্দেশ মতো জনপ্রিয় কবি ফারাযদাককে বন্দী অবস্থায় দামেস্কে নেয়া হলো। এদিকে হিশাম পিতৃ সমীপে উপস্থিত হয়ে হজ চলাকালীন সমস্ত ঘটনার বিবরণ আবদুল মালিককে অবহিত করেন। একই সঙ্গে তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র তুমুল জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা বিষয়ও পিতাকে জ্ঞাত করে উমাইয়া শাসনের ধারাবাহিকতা নিরাপদ রাখার স্বার্থে দ্রুত ইমাম সাহেবকে গ্রেফতার করার অনুরোধ জানান। মুসলিম জাহানের ভবিষ্যত বাদশাহ্ হজের সময় জনসম্মুখে অপমানিত হয়েছেন– এমন তথ্যে আবদুল মালিক মদিনার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠান, "হোসাইন (রা.) তনয় যয়নুল আবেদীনের দুপায়ে শিকল পরিয়ে দামেস্কে প্রেরণ করা হোক।"

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বাদশাহ্ আবদুল মালিকের দরবারে বন্দী ইমাম (রা.)

এ ধরনের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও আবদুল মালিক ইমাম সাহেবের জনপ্রিয়তা, তাকওয়া, রিয়াজত, জনসেবা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব থেকে জ্ঞাত ছিলেন। পাঠ্য অবস্থায় তিনি মদিনা শরিফে অবস্থান কালে খুব কাছে থেকেই ইমাম সাহেবকে দেখেছেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকায় আবদুল মালিক তাঁকে ভয় করতেন। দামেস্কে রাজদরবারে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে উপস্থিত করা হলে ইমাম সাহেবের প্রশান্ত এবং জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আবদুল মালিক অভিভূত হয়ে পড়েন। মহান সাধকের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত অপার্থিব আলোকরশ্মিতে আবদুল মালিকের দু'চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ বিব্রত অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে সভাসদদের ডেকে নেন। এ সভাসদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম জুহরী। আলোচনার এক পর্যায়ে ইমাম জুহরী বলেন, "ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র কোন আচরণ রাজদ্রোহিতামূলক বা আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যসূচক– এমন কোন প্রমাণতো আপনার কাছে নেই। ইনি তো ইবাদত বন্দেগীতে এমনভাবে মগ্ন থাকেন যে, তাঁর কাছে তাঁর নিজের সম্পর্কেই খবর থাকে না। অতএব আমার মতে এধরনের একজন আবেদ লোককে কোনরূপ কষ্ট না দেয়াই উত্তম। এখন আপনার যা অভিরুচি হয় করুন। আবদুল মালিকের নিকট জুহরীর প্রস্তাব মনপুত হয়। তিনি ইমাম সাহেবকে সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। এদিকে জন উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে কবি ফারাযদাককেও মুক্তি দেয়া হয়।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন অজস্র মানুষ প্রতিবাদ-বিক্ষোভের লক্ষ্যে মদিনার রাস্তায় নেমে আসে। মদিনায় ইমাম সাহেবের জনপ্রিয়তা এবং জনসম্পৃক্ততা সম্পর্কে উমাইয়া শাসকরা পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। ফলে সরকারী কর্মকর্তারা পূর্বাহ্নে কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রাখে। সরকারী

ব্যবস্থা এমন ছিল যে, ইমাম সাহেবকে মুক্ত করতে হলে সংঘর্ষ ব্যতীত উপায় নেই। অত্যন্ত শান্ত এবং ধীর স্থির ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এমনিতেই সাংঘর্ষিক অবস্থা পছন্দ করেন না। তিনি জনগণকে শান্ত থেকে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনম্র ফরিয়াদের উপদেশ দেন। চরম বিপদে ধৈর্য ধারণের উপদেশ তাসাওউফ ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত পন্থা।

হিশামের চরম বিপদ এবং দুর্দিনে ইমাম যয়নুল আবেদীন

ইন্তিকালের পূর্বে আবদুল মালিক পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে হিশামের পরিবর্তে ওলীদ ইবনে আবদুল মালিককে বাদশাহ্ নিযুক্ত করেন। দামেস্কের সিংহাসনে পদাসীন হয়ে আল ওলীদ মদিনাবাসীর অসন্তুষ্টি এবং ক্ষোভ নিবারণ কল্পে গভর্নর পদ থেকে আপন ভ্রাতা হিশামকে অপসারণ করে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) কে গভর্নর পদে নিযুক্তি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিশাম মদিনাবাসীর প্রতি এতো দুর্ব্যবহার-অত্যাচার করেছিলেন যে, মদিনাবাসী উমাইয়া রাজত্বের প্রতি সম্পূর্ণ অনীহ এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওলীদ মদিনাবাসীর ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে হিশামের যথাযথ শাস্তির নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নতুন গভর্নর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ হিশামের দুষ্কর্মের প্রতিকার হিসেবে প্রাথমিকভাবে হিশামকে বন্দী করেন। মদিনাবাসীর অজস্র অভিযোগ শোনার জন্যে তিনি প্রকাশ্যে বিচারের ব্যবস্থা করেন। হিশামকে মারওয়ান ইবনে হাকামের বাড়ির সামনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় মদিনাবাসীর মধ্যে যাঁদের যে অভিযোগ আছে তাঁরা যেন সকলেই ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ হাতে তার প্রতিকার করেন। রাজাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অসংখ্য নির্যাতিত মানুষ মারওয়ানের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে হিশামকে লাঞ্ছিত করে। দিবা-রাত্রি তিন দিন ধরে হিশাম ব্যাপকভাবে লাঞ্ছিত হয়। ইতোমধ্যে এ ধরনের বিচার সম্পর্কে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অবহিত হন। উল্লেখ্য যে, হিশাম ইবনে আবদুল মালিক মদিনার গভর্নর থাকাকালে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত-অনুসারী-অনুগামীদের প্রতি অহেতুক সর্বাপেক্ষা কঠিন নির্যাতন করেছিল। ইমাম সাহেবের আগমন সংবাদ শুনে হিশাম শিউরে উঠে। তার মনে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার হয়। ইমাম সাহেবের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যে নির্যাতন হিশাম করেছে এর প্রতিকার যদি তিনি কামনা করেন, শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকবে না। এদিকে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) মারওয়ান ইবনে হাকাম এর বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছেন-সংবাদ পেয়ে অসংখ্য লোক হাত-পায়ে বেড়ী বন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান হিশাম সম্মুখে উপস্থিত হন। হিশামের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন বলেন,

"আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া হিশাম।" পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে ইমাম সাহেব বলেন, "হিশাম ভয় পেয়ো না, তোমার প্রয়োজন থাকলে বলো, আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।" উপস্থিত লোকদের তিনি বলেন, "হিশাম এখন পদচ্যুত, ক্ষমতাহীন, দুর্বল। এমন লোককে কষ্ট দেয়া সমীচীন হবে না। আপনারা একে ক্ষমা করে দিন।" হিশাম ইমাম সাহেবের প্রসারিত হাত ধরে ক্রন্দন করতে থাকে। ইমাম সাহেব উমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট সুপারিশ করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করেন। নির্যাতন-উৎপীড়ক হিশামের প্রতি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে তাকওয়া, তাসাওউফ এবং বেলায়তের সহজ, সরল এবং উদারতার প্রতিফলন।

শাসন নয়, নৈতিকতা এবং মননশীলতার বিকাশ জরুরী

বিশ্বনবি (দ.) এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস এবং নির্দেশনা, "আমি জ্ঞানের নগর এবং আলী তার দরজা।" এই হাদীসের মাধ্যমে মূলতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে বিশ্বনবি (দ.) তাঁর উম্মতদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে আত্ম সমালোচনা করে আত্মশুদ্ধ হবার প্রক্রিয়া। আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নিজে সংশোধন ও সংস্কার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। আত্মসংস্কারে পরিবর্তিত মানুষের মননশীল রূপান্তরে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করে থাকে। মানুষ এবং সমাজ হয়ে উঠে সুউচ্চ নৈতিকতার প্রতি ধাবমান। আওলাদে রাসুল (দ.) এবং আওলাদে আলী (রা.) হিসেবে তিনি মানুষের নৈতিক পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত এবং উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিশ্বাস শুধু শাসন বা কঠোরতা অবলম্বন করে মানুষকে নৈতিকতা, মননশীলতা এবং আদর্শের পথে সুদৃঢ় রাখা সম্ভব নয়। সর্বোপরি শুধু শাসন এবং কঠোর পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মানবচিত্ত এবং মনোবৃত্তিকে সাময়িকভাবে দমন করা যায়। এটি মানব মনোবৃত্তি পরিবর্তনের স্থায়ী ঔষধ বা চিকিৎসা নয়। বরং ইসলাম ধর্ম নির্দেশিত পন্থা এবং মহাগ্রন্থ কোরআনের মহামূল্যবান বাণীর তালিম প্রদান এবং সে ধারায় আমল করে আখলাকের পরিবর্তন সাধন করলে মানুষের পরিবর্তন সহজতর হয়। এর ফলে গড়ে উঠবে মানব সভ্যতা-বিশ্ব সভ্যতা। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অধিকারের নামে সীমালংঘনকে দোষণীয় প্রবণতা হিসেবে গণ্য করতেন। তাঁর মতে মানুষ অধিকারের নামে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক অপকর্ম সাধন করে থাকে। এধরনের প্রবণতা দমন ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বাহ্যিক শাসন এবং কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন শুধু সঙ্গত নয়, শাসকের জন্যে অত্যাবশ্যকও বটে। ইমাম যয়নুল আবেদীন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ইসলাম ধর্ম পরিবারের জন্যে যেমন অধিকারের সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, তেমনি সমাজ জীবন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, জাতিতে-

জাতিতে সম্পর্ক বিষয়েও চমৎকার বিধি-বিধান এবং নির্দেশনা প্রদান করেছে। নিষ্কলুষ অন্তরে পরম সরলতায় এগুলো অনুশীলিত হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বসবাস করে মানব সমাজ সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। তাঁর মতে যেখানে ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান লংঘিত হয়েছে সেখানেই মানবতা বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইবাদত-বন্দেগী প্রসঙ্গ

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) প্রাণহীন ইবাদত-বন্দেগীকে অর্থহীন মনে করতেন। লোক দেখানো ইবাদত তথা 'রিয়া' আল্লাহ্‌র কাছে শুধু অগ্রহণযোগ্য নয়, বরং শাস্তিযোগ্যও বটে। তিনি বলতেন প্রতিটি ইবাদতে প্রাণ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন আল্লাহ্‌র প্রতি পরম মহব্বত। তিনি বলতেন সামাজিক চাপ, আইনের ভয়, এমনকি আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে নয়, বরং আল্লাহ্‌র প্রেমে কর্তব্য এবং দিওয়ানা মনে পরম শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সার্বিক আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে ইবাদতের প্রাণ। এজন্যে প্রয়োজন কঠোর সাধনা, রিয়াজত, মনের গভীরে একাগ্রতা অর্জন। আধ্যাত্মিকতা তথা তাসাওউফ ব্যতীত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। মসজিদে নববিতে ইবাদতের একাগ্র ধারায় ইমাম যয়নুল আবেদীন আগত ভক্ত- অনুরাগীদেরকে এ সম্পর্কে উত্তম তালিম প্রদান করতেন। তাঁর নির্দেশিত ধারার প্রাণবন্যায় উদ্বেলিত হয়ে তাঁর পুত্র ইমাম বাকের (রা.)'র নিকট থেকে প্রাপ্ত বেলায়তের আমানতদার হযরত ইমাম জাফর সাদেক তাসাওউফকে স্বতন্ত্র ইলম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাসাওউফের এ শিক্ষা তাঁরা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) থেকে, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁর পিতা নবিজি (দ.) এর ইলমের দরজা হযরত আলী (রা.) থেকে এবং হযরত আলী (রা.) তাসাওউফ ইলমের সর্বোচ্চ তাজের আমানতদারীত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) থেকে।

ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) মতে তাসাওউফের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে সকল প্রকার অহংকার, দেমাগ, আমিত্ব তথা হাস্তীর বিনাশ করে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করা। এর ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র একক সত্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভুত হবে। সাধক যখন নিজেকে একক সত্তার মধ্যে অন্তর্লীন করে দেয় তখন সকল কাজ-কর্ম, ইবাদত, বন্দেগী আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। অহংকে পদানত করে বিনয় ও বিনম্রতার মাধ্যমে মানুষ মহামানবে পরিণত হয়। ইমাম যয়নুল আবেদীন তাঁর সমগ্র জীবনে কর্ম-ধারার মাধ্যমে এর বহু প্রমাণ রেখেছেন।

উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম সেনা অভিযানে সাফল্যের জন্যে দোয়া

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র মহান পিতা, তাঁর ভাই এবং নিকটতম আত্মীয় স্বজনের আঠারজন উমাইয়া শাসকদের বর্বরতায় কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে শহীদ হন। উমাইয়া শাসকরা মদিনা শরিফে অবস্থানরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে কড়া নজরদারীতে রাখতো। সবসময় মদিনায় অত্যাচারী-জালিম স্বভাবের শাসক নিয়োগ দিত। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইমাম সাহেবের বিপুল জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রতি জনগণের শর্তহীন আনুগত্য, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাপোষণ সম্পর্কে বিশেষভাবে সন্দিহান ছিলেন। আবদুল মালিক নিজের শাসনকার্যের স্বার্থে ইমাম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে বহুবার চেষ্টা করেন। কোন রকম প্রলোভন বা শাসকদের মর্জি পূরণের লক্ষ্যে তিনি ব্যবহৃত হননি। বরং তিনি সাধনা, সৎকর্ম এবং ফকিরী জিন্দেগীতে জীবন-যাপনে সর্বাবস্থায় ছিলেন অটল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আবদুল মালিক তাঁকে কোনভাবে প্রলুব্ধ করতে না পেরে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন, কখন তিনি উমাইয়াদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার নেতৃত্ব দিচ্ছেন? ইমাম সাহেবের প্রতি সন্দেহ প্রবণ হয়ে আবদুল মালিক মদিনার শাসক হিসেবে দায়িত্বপালনরত তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর পুত্র আবানকে অপসারণ করে হিশাম ইবনে ইসমাইল মাখযুমীর মতো নির্মম নিষ্ঠুর স্বভাবের ব্যক্তিকে পদাসীন করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা.) এর পুত্র আবান ছিলেন নিতান্ত সৎ এবং সরল স্বভাবের। এ ছাড়া নবিজি (দ.)'র পরিবারের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল। আবদুল মালিক এ ধরনের সরল-সহজ ব্যক্তিকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নিয়োগের মূল কারণ ছিল ইমাম যয়নুল আবেদীন এবং তাঁর ভক্ত-অনুসারীদেরকে মানসিক চাপে রাখা।

বিভিন্নভাবে অপদস্থ এবং নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও উমাইয়া শাসনামলে মুসলিম বাহিনীর বিজয় এবং সাফল্যকামনা করে তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সবসময় ফরিয়াদ পেশ করতেন। পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে ভারতের সিন্ধু এবং চীন সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে তাওহীদের পতাকা হাতে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর অভিযানসমূহে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে তিনি দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতেন। এ সমস্ত অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সম্মানিত সাহাবাদের আওলাদগণ। সিন্ধু অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পরম সত্যাশ্রয়ী প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)'র পৌত্র কাসেম ইবনে মুহাম্মদ এর পুত্র তরুণ সিপাহসালার মুহাম্মদ বিন কাসেম। মুসলিম বাহিনীর সাফল্যের জন্যে তাঁর মুনাজাতের ভাষা এতোই

আত্মনিবেদন-আবেগপূর্ণ ছিল যে, তাতে মুসলিম বাহিনীর অন্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে যুদ্ধরত হবার জন্যে অসীম প্রেরণার সৃষ্টি করতো।

কাবুল এবং ভারতে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পেয়ে তিনি মসজিদে নববিতে অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে দোয়ায় উল্লেখ করেন, "হে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্! ইয়া রাহমানুর রাহীম!! আপনার তাওহীদের বার্তা এবং ইসলাম ধর্মের দাওয়াত-পৃথিবীর অন্ধকার জনপদগুলিতে ছড়িয়ে দেয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে যারা আজ জীবন পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের অস্ত্রকে আপনি শাণিত করে দিন। তাদেরকে হেফাজত করুন। তাদের শক্তিকে অজেয় করে দিন। পরস্পর মহব্বত এবং সহমর্মিতা সুদৃঢ় করে দিন। হে মহান পরওয়ারদিগার! ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যারা অভিযানরত তাদেরকে গায়েবী শক্তি দ্বারা সাহায্য করুন। তাদেরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি ও সাহস দিন। তাদের বাহুতে বল দিন। হে মাওলা! দুশমনের মোকাবিলা কালে এ সমস্ত গাজীদেরকে দুনিয়ার লোভ লালসা, সম্পদের মোহ, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার মতলব থেকে দূরে রাখুন। তাদেরকে ওয়াসওয়াসা মুক্ত রাখুন। এদের অন্তর এবং দৃষ্টিতে একমাত্র আপনার দ্বীন প্রচার ও প্রসারের অঙ্গীকারকেই বুলন্দ রাখুন। তাদের অন্তরে জান্নাতের আকঙ্ক্ষা সর্বাবস্থায় জাগ্রত রাখুন। হে মহান মাবুদ, আল্লাহ্! ইসলামের গাজীদেরকে প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে জয়যুক্ত করুন। তাদেরকে সকল প্রকার বালা মুসিবত এবং মুশকিল থেকে মুক্ত রাখুন। তাদের সকল সমস্যা আপনার নিজের তরফ থেকে মিটিয়ে দিন। মাওলায়ে করীম! তাদেরকে বিজয়ী বেশে সহী সালামতে পরিবার পরিজন এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে ফিরে আসার তাওফিক দিন। হে মাবুদ! আপনি তাদের উপর খাস রহমত নাযিল করুন।" ইমাম সাহেবের এ ধরনের বিনম্র মুনাজাতের ফলশ্রুতিতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের সভ্যতার ফসিল এবং বহু ঈশ্বরবাদের প্রতীকী উপাসনা স্থল সিন্ধুতে স্থায়ীভাবে উত্তোলিত হয় তাওহীদের পতাকা।

আবদুল মালিককে অলৌকিক তথ্য দান

উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক এমনিতেই ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে খুবই সমীহ করতেন। ইমাম সাহেব সম্পর্কে এক ধরনের ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে কাজ করতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মম স্বভাবের শাসক হিসেবে কুখ্যাত ছিলেন। তাঁর হাতে সাহাবা-তাবেঈনসহ প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ বিভিন্ন সময়ে শহীদ ও নিহত হয়। হাজ্জাজের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞাত আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বনি আবদুল মুত্তালিবের আওলাদদেরকে হত্যা এবং নির্যাতন না করার নির্দেশনা দিয়ে হেজাজের

গভর্নর হাজ্জাজ সমীপে পত্র প্রেরণ করেন। কেননা, আবু সুফিয়ানের বংশধররা তাদের রাজত্ব তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যাবে বলে সর্বত্র চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি করে হত্যার মহোৎসব চালিয়ে থাকে। এটি ছিল হাজ্জাজের নিকট অতি গোপনীয় নির্দেশনামা। এ পত্র সম্পর্কে আবদুল মালিক এবং হাজ্জাজ ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত ছিলেন না। কিন্তু হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) অতি গোপনীয় নির্দেশনামায় লিখিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান। তিনি এ নির্দেশের তারিখ উল্লেখপূর্বক চিঠির তথ্য ও বিষয় অবহিত করে আবদুল মালিক সমীপে লিখেন, "আপনি অমুক দিন হাজ্জাজকে এ মর্মে পত্র লিখেছেন। রাসূলুল্লাহ (দ.) আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছেন যে, এ পত্র আল্লাহ্‌তা'আলা খুব পছন্দ করেছেন। এ কারণে আল্লাহ্ আপনার রাজত্বকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করেছেন।" পত্রের বাক্যাবলীতে সম্পূর্ণ তথ্য উল্লেখ করে একজন গোলামকে নিজের উষ্ট্রীতে সওয়ার করে আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করেন। আবদুল মালিক ইমাম সাহেব প্রেরিত পত্রের তারিখের সঙ্গে নিজে প্রেরিত তারিখ ও দিনের সঙ্গতি দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তখন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সত্য এবং সঠিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় আস্থা জন্মে। তিনি এ তথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে উষ্ট্রীর পিঠে যতটুকু বহন সম্ভব সে পরিমাণ দিরহাম এবং দীনার ইমাম সাহেব সমীপে হাদীয়া হিসেবে পেশ করেন।

কাবাগৃহ তাওয়াফ কালে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং আবদুল মালিক

সচেতন উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক লক্ষ্য করেন যে, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকা সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের বিশাল অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইমাম যয়নুল আবেদীনের (রা.) ব্যক্তিত্বের প্রভাব, জনপ্রিয়তা, জনগণের আনুগত্য এবং আস্থা সীমাহীন। আবদুল মালিকের নিকট বিষয়টি ধীরে ধীরে অসহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষায় রূপ নেয়। তিনি ইমাম সাহেবকে বশীভূত করে নিজের পক্ষে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। কিন্তু কখনো সফল হননি।

একবার পবিত্র হজ পালনার্থে আবদুল মালিক কাবা শরিফে আসেন। কাবাগৃহ তাওয়াফ কালে তিনি লক্ষ্য করেন ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) গভীর একাগ্রতায় কাবাগৃহ তাওয়াফ করছেন। ইমাম সাহেব এতো তন্ময় অবস্থায় তাওয়াফ রত আছেন যে কাবাগৃহ ব্যতীত অন্যকোন দিকে তাঁর মোটেও নজর নেই। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন ভক্তও একাগ্রভাবে কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ করছেন। আবদুল মালিক এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে তাঁর সম্মুখ দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকবার

তাওয়াফরত থাকেন। কিন্তু গভীর ধ্যানমগ্ন ইমাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি ব্যর্থ হন। এতে আবদুল মালিক খুবই ক্ষুব্ধ হন। তাওয়াফ শেষে আবদুল মালিক এক কিনারায় এসে বসেন। তিনি আশা করছিলেন হয়তো তাওয়াফ ও ধ্যান শেষে ইমাম যয়নুল আবেদীন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। কিন্তু ইমাম সাহেব সেদিকে আসেননি। এতে আবদুল মালিকের ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। অতঃপর আবদুল মালিক ইমাম সাহেবকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে ডেকে পাঠান। এবার ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) শিষ্টাচার রক্ষার্থে আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান।

ইমাম সাহেব উপস্থিত হলে অনেকাংশে অভিমান এবং ক্ষোভের সুরে আবদুল মালিক বলেন, "যয়নুল আবেদীন আলী ইবনে হোসাইন (রা.)! আপনার পিতাকে আমি হত্যা করিনি। এর পরও আপনি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন বলে ধারণা হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন না কেন?" নির্ভীক ইমাম সাহেব অত্যন্ত শান্তভাবে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন, "আমার পিতার হত্যাকারীরা আমাদের দুনিয়ার জীবন বরবাদ করেছে। আর আমার মহান পিতা মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করে তাদের আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছেন। আপনিও যদি আমার প্রতি অকারণে বিদ্বেষ পোষণ করে নিজের আখেরাত ধ্বংস করতে চান, তবে সানন্দ চিত্তে তা করতে পারেন। আমার তরফ থেকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে না।"

ইমাম সাহেবের গম্ভীর ভাষায় এ ধরনের জবাবের জন্যে আবদুল মালিক মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। অতঃপর আমতা আমতা করে বলেন, "না তা নয়। এমন চিন্তা আপনি কেন করছেন? আপনার তো উচিত আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তাও তো বলতে পারেন, আমি আনন্দের সাথে তা পূরণ করে দেব।'

জবাবে ইমাম সাহেব বলেন, "আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান! এটি আল্লাহ্‌র ঘর। এখানে সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করা উচিত।" ইমাম সাহেবের জবাবে আবদুল মালিক মনে মনে রাগ করলেন বটে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘরে বসে আর বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস করেননি।

এর পর ইমাম সাহেব আবদুল মালিকের সম্মুখ থেকে উঠে পুনরায় কাবা শরিফের সন্নিকটে গমন করেন। পবিত্র কাবার দেয়াল জড়িয়ে ধরে তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ পেশ করে বলেন, "ইলাহী! দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা দরজায় নানা ধরনের পাহারাদার নিয়োজিত রেখেছে। মজলুম দুঃখী মানুষের পক্ষে সেই সমস্ত বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আপনার মহান দরবারের দরজা সর্বাবস্থায় সকলের

জন্যে খোলা থাকে। এখানে বেড়াজাল সৃষ্টি করার সাধ্য কারো নেই। আমি মিসকিন বেশে একমাত্র আপনারই দরজায় সকল নিবেদন পেশ করছি। হাজারো প্রার্থীর কণ্ঠে আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী একজন ছায়েল মাত্র। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। এটাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।" ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর চারিত্রিক এবং কর্ম বৈশিষ্ট্যে দুনিয়ার প্রতাপশালী শাসক-সম্রাট এবং আধ্যাত্মিক সম্রাটের সম্মান ও মর্যাদাগত পার্থক্য সর্বত্র স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কে মহান আল্লাহ্ প্রকৃত অর্থে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন, যা 'ওয়াতুইজ্জু মান্তাশা'র বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এ স্তরের সম্মান ব্যতিক্রম ব্যতীত কোন পার্থিব শাসকের কপালেও জুটেনা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইবাদত প্রক্রিয়া এবং যয়নুল আবেদীন উপাধি ও অলৌকিক অধ্যায়

নবিজী (দ.) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) প্রকৃত অর্থে এক প্রকার ফকিরী জীবন যাপন করতেন। সর্বদাই তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রকৃত নাম আলী আসগর। অত্যধিক ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকার কারণে তাঁর উপাধি হয় যয়নুল আবেদীন, অর্থাৎ ইবাদতকারীদের ভূষণ বা অলংকার। পরবর্তী সময়ে যয়নুল আবেদীন নামের বিপুল পরিচিতির সম্মুখে মূল নাম আলী আসগর জনসম্মুখে হ্রাস পায়। দীর্ঘসময় নামায ও সিজদারত থাকতেন বিধায় তিনি 'সাজ্জাদ' নামেও পরিচিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক আবু নায়ীম উতাবীর সূত্রে হিলিয়া গ্রন্থে লিখেছেন, "ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ওযু করে ফারেগ (পৃথক) হলে অধিক প্রকম্পিত হতেন। তাঁর শরীর মুবারক থেকে ঘাম টপকাতে শুরু হতো।" তাঁর এ ধরনের শারীরিক অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি কার সাথে কথোপকথন করেছি তা কি তোমরা অনুভব করতে পার না? কার সম্মুখে হাজির হচ্ছি তা কি তোমরা জান না?"

সালাত আদায় কালে তাঁর মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের (রা.) মতো গভীর তন্ময়, ধ্যানমগ্নতা এবং অতুলনীয় একাগ্রতা বিরাজ করতো। এক রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে মশগুল ছিলেন। এমন সময় ইবলিশ এক বিষধর সাপের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়ে তার পাদদেশে উপস্থিত হয়। ইবলিশের ধারণা ছিল গভীর রাতে নির্জন ইবাদতকালে বিষধর সাপের ভয়াবহ আকৃতি দেখে তিনি তাহাজ্জুদ থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু তিনি সাপের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেননি। তানহায়ী ইবাদতের প্রেম এবং প্রাণ প্রবাহ তাঁর মধ্যে এতো তীব্র ভাব জাগিয়ে তুলেছিল যে নামাযরত ইমাম সাহেবের পবিত্র কদমের বৃদ্ধাঙ্গুলি সাপটি মুখে পুরে নেয়। এর পরেও তাঁর

সেদিকে কোন খেয়াল নেই, তাঁর একাগ্রতা বিন্দুমাত্র টলেনি। সাপের আকৃতিধারী ইবলিশ অতঃপর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভীষণ রূপে দংশন করে। এতে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেও তিনি নামায ছাড়েননি। ইতোমধ্যে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নূরানী অন্তরে ফুটিয়ে তোলেন যে, -এটি সাপ নয়, বরং ইবলিশ-শয়তান।' সাপটিকে তিনি তিরস্কার করেন এবং প্রহার করে বলেন, "হে দূরাচারী শয়তান, দূর হয়ে যা।" অতঃপর তিনি আবার নামাযে দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যথা খতম হয়ে যায়। ইতোমধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে একটি আওয়াজ শুনেন, কিন্তু আওয়াজকারীকে দেখেননি। আওয়াজকারী বলিষ্ঠ কন্ঠে বলে যাচ্ছেন, "আপনি যয়নুল আবেদীন, আপনি যয়নুল আবেদীন, আপনি যয়নুল আবেদীন।" তখন থেকেই তাঁর পরিচিতি যয়নুল আবেদীন হয়ে যায়।

একবার তিনি গৃহে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় ঘরে আগুন লেগে যায়। তিনি সিজদাতেই পড়ে থাকেন। লোকেরা কানফাটা আওয়াজ তুলে বলে উঠে, আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে। কিন্তু তিনি সিজদা থেকে মাথা তুলেননি। আগুন নিভানোর পরে উপস্থিত লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি আগুন থেকে গাফেল রইলেন কেন? সহজ ভাষায় উত্তর দিলেন, "আখেরাতের আগুনের ভয়ে।"

আরেকবার ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) নামাযরত আছেন। এমন সময় ভূমিকম্প শুরু হয়। লোকজন হতবিহ্বল হয়ে চিৎকার করে নিরাপত্তার আশায় রাস্তায় নেমে আসে। ইমাম সাহেব এতোই বিভোর চিত্তে নামাযরত যে তিনি তা টেরই পাননি। ইমাম যয়নুল আবেদীনের সুকঠিন সাধনা সর্বসাধারণের ধারণাতীত। প্রায় সবসময় তিনি মদিনার পবিত্রতম রওজা আকদসের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে ইবাদত রত থাকতেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ছিলেন তাসাওউফ জগতের অনন্য উপমা। তাঁর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং পরম প্রীতিময় আনুগত্য ছিল সীমাহীন। মসজিদে নববি বা অন্য যে কোন মসজিদে নামাযরত থাকলে তিনি ছিলেন উপস্থিত সকল নামাযীদের বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। নামায থেকে ফারেগ হলে সকল মুসল্লি সারিবদ্ধভাবে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর জন্যে অপেক্ষারত থাকতেন। যখন তিনি বের হতেন তখন একে একে সব মুসল্লি পরম শ্রদ্ধায় তাঁর পবিত্র হস্তে পরশ বুলানোর জন্যে চেষ্টা করতেন। মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পবিত্র হাতের পরশে চেহারাগুলো নূরানী আভায় উদ্ভাসিত হবে। পরিবারের সদস্যসহ তাঁর অনেক ভক্ত-অনুসারী ইবাদত বিষয়ে তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাদের পক্ষে এ ধরনের ইবাদত কর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তিনি তাদেরকে তাঁর মতো ইবাদত করা সম্ভব নয় বলে অবহিত করে নিজেদের সামর্থের মধ্যে ইবাদত করতে পরামর্শ দেন।

ইমামত বিষয়ে হাজরে আসওয়াদ এর মীমাংসা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদাতের পর ইমামত প্রশ্ন মীমাংসার জন্যে হযরত আলী (রা.)'র পুত্র মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রা.) হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে আগমন করেন। তিনি ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র নিকট প্রস্তাব করেন যে, "আমি তোমার চাচা এবং বয়সেও বড়। অতএব, আমিই ইমামতের অধিক হকদার। তুমি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র হাতিয়ার আমাকে সমর্পণ কর।" এ ধরনের প্রস্তাবে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "চাচা! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং যে বিষয়ের যোগ্য আপনি নন, তা দাবী করবেন না।" এর পরেও হযরত হানাফিয়া বেশ জোরে শোরে ইমামত দাবী করলে তিনি বলেন, "চাচা! চলুন বিচারকের কাছে যাই। বিচারক ইমামতের বিষয়টি আমাদের কাছে ফয়সালা করে দেবেন।" স্বাভাবিকভাবে হযরত হানাফিয়া বিচারকের পরিচয় জানতে চান। হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) জানান, "বিচারক হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ, তথা কৃষ্ণপাথর।" হযরত হানাফিয়া হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)'র প্রস্তাবে সম্মত হয়ে হাজরে আসওয়াদের নিকট গমন করেন। হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)'র অনুরোধ অনুযায়ী হযরত হানাফিয়া (রা.) হাজরে আসওয়াদের সম্মুখে কথা বলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসেনি। এরপর হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) দোয়ার জন্যে হাত তুলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে গুণবাচক নাম ধরে ডাকেন। ফলে হাজরে আসওয়াদ কথা বলতে শুরু করে। অতএব তিনি স্বীয় পবিত্র মুখমন্ডল হাজরে আসওয়াদের দিকে ফিরিয়ে বলেন, "তোমাকে পরওয়ারদিগারের কসম, যিনি বান্দার ওয়াদা তোমার উপর রেখেছেন। আমাদেরকে বলো, হযরত হোসাইন (রা.)'র পরে ইমামতের হক কার? হাজরে আসওয়াদ কেঁপে উঠে এবং স্থানচ্যুত হবার উপক্রম হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় বলে, "হে মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, এটা স্বীকৃত যে, হোসাইন (রা.)'র পর আলী ইবনে হোসাইন (রা.) (যয়নুল আবেদীন) ইমামতের হকদার।

ইবাদত কালে অত্যধিক রোনাজারি এবং কান্নাকাটি

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এতো বেশি কান্নাকাটি করতেন যে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। এ বিষয়ে মুহাদ্দিস ইমাম তাউসের একটি বর্ণনা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি মসজিদে হারামে মীযাবে রহমতের নিচে এক লোককে নামাযান্তে মুনাজাতে খুবই কান্নাকাটি করতে দেখলাম। মুনাজাত শেষ হলে দেখি তিনি হলেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)। আমি আরজ করলাম হে নবি

কন্যার মহামানব! আমার বিশ্বাস আপনি তিনটি কারণে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকারী। আপনি নবি কন্যার সন্তানের সন্তান। আপনার দাদাজান আপনার জন্যে শাফায়াত করবেন। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম রহমত। এমতাবস্থায় এতো ভয় ভীতির কারণ কী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, হে তাউস! আমি রাসুলের (দ.) সন্তান বটে কিন্তু নিরাপদ নই। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "সে দিন পরস্পরের আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবরও নিবে না।'

আর তুমি আল্লাহ্ পাকের রহমতের কথা বলছ, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন; "আল্লাহ্‌র রহমত নেককারদের অতি নিকটে।" আমি নিজেকে মুহ্‌সিনদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি না। আর তুমি দাদার (হযরত আলী রা.) সুপারিশের কথা বলছ, "তিনি শুধুমাত্র এ সমস্ত লোকের জন্যে সুপারিশ করবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন।" অবশ্য হুজুর (দ.) আল্লাহ্‌র মহান দরবারে একমাত্র সাফায়াতের অধিকারপ্রাপ্ত হিসেবে নির্দেশনা পাবেন।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র ইবাদত প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন, "ইবাদত রিয়াজত, তাকওয়া, উদারতা এবং মধুর চরিত্র শিষ্টাচারিতার কারণে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন ইসলামের প্রশান্তি এবং সৌন্দর্য ও নিদর্শন হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অতি সুগন্ধময় আতর ব্যবহার করে উত্তম পোশাক পরিধান করে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। সফর বা অন্য কোন অবস্থাতেই তিনি রাতের নামায তরক করতেন না। অধিক পরিমাণে মুনাজাতে, জিকির আজকার এবং আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। কাকুতি-মিনতি এবং একাগ্রতার সাথে সিজদাবস্থায় দীর্ঘ মুনাজাতে ব্যাকুল হয়ে কান্নাকাটি করতেন।" ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, "কুরাইশ বংশে আলী ইবনে হোসাইন (রা.)'র মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক সমকালীন যুগে আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।" তিনি বহুবার ওমরাহ এবং হজ পালন করেন। এর মধ্যে অনেকবার পায়ে হেঁটে তা সম্পন্ন করেন। উটে সওয়ার হয়ে হজ পালন করেন বিশবার।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সবসময় দিনে রোজা রাখতেন ও পুরো রাত জেগে ইবাদত করতেন। ইফতারির সময় তিনি মহামান্য পিতার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থার কথা উল্লেখ করে এতো বেশি কান্নাকাটি করতেন যে, অশ্রুতে খাবার ভিজে যেত এবং খাবার পানিতেও অশ্রু মিশে যেত। শেষ পর্যন্ত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র অন্তর ছিল চরম বেদনাভরা এক করুণ জীবন। তাঁর নিয়মিত কান্নাকাটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে একদিন খাদেম তাঁকে বলেন, "আপনার দুঃখ ও আহাজারি শেষ হয়নি?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "তোমার জন্যে আক্ষেপ! হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ্‌র

একজন নবি ছিলেন। তাঁর ১২ জন সন্তান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর এক পুত্র ইউসুফকে চোখের আড়ালে রাখার শোকে, দুঃখে এবং অতিরিক্ত কান্নায় তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে পড়েন, চুল পেকে যায় ও পিঠ বাঁকা হয়ে যায়। সন্তান জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর এ অবস্থা হয়েছিল। আর আমি আমার পিতা, ভাই এবং পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে মাটিতে পড়ে যেতে ও শহীদ হতে দেখেছি, তাই কিভাবে আমার দুঃখ ও অশ্রু থামতে পারে?"

কারবালার ঘটনার পর যখন তাঁকে উটের খালি পিঠে আরোহন করিয়ে দামেস্কে ইয়াজিদের সম্মুখে হাজির করা হলো, তখন কোন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, হে আলী, রহমতের গৃহের অধিবাসী! বলেন আপনার অবস্থা কী? আপনি কেমন আছেন? জবাবে যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "হযরত মুসা (আ.)'র সম্প্রদায় ফিরাউনের হাতে যে অবস্থায় ছিল, আমার অবস্থাও আমার জাতির হাতে তেমনি। ফিরাউন যেমন ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, আমার অবস্থাও সেরূপ। এ বিপদ ও পরীক্ষার সময় আমি বলতে পারি না যে, কখন রাত হয় আর কখন দিন আসে। অবশ্য সে অবস্থায়ই আমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি এবং বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করছি।" এরূপই ছিলেন পরম ধৈর্য এবং দৃঢ়চিত্তের ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

উমাইয়া বন্দীশালায় অলৌকিক ঘটনা এবং কারামত

পুত্র হিশামের অভিপ্রায় অনুযায়ী উমাইয়া বাদশাহ্ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর পদযুগল বন্ধন, হাতে শিকল ও ঘাড়ে বেড়ি পড়িয়ে দামেস্কে নেয়া হয় তখন তিনি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। ইমাম যুহরী এ দৃশ্যের বর্ণনায় উল্লেখ করেন, "আমি তাঁকে সালাম করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তাঁকে এ ধরনের অপমানজনক অবস্থায় দেখে আমি কেঁদে ফেলি। মনের আবেগের প্রচণ্ড উত্তাপে বলি, কতো ভালো হতো যদি আপনার জায়গায় আমাকে বেড়ি পরানো হতো এবং আপনি মুক্ত থাকতেন।" প্রতিক্রিয়ায় ইমাম সাহেব বলেন, "আপনি কি মনে করেন আমি এ সব বন্ধন ও বেড়ির কারণে কষ্টে আছি? আমি ইচ্ছে করলে এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে খসে পড়তে পারে। কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টান্ত থাকা উচিত, যাতে আপনারা আল্লাহ্র শাস্তিকে স্মরণে রাখেন এবং হাশরের পরিস্থিতি আপনাদের জন্যে সহজ হয়।" এরপর তিনি আপন হাতে শিকল খুলে ফেলেন এবং পদযুগলও বন্ধন মুক্ত করে নেন। অতঃপর বলেন, "হে যুহরী! আমি এ গুলোসহ এ অবস্থায় দু'মনজিলের বেশি যাব না।" চার দিন অতিবাহিত হবার পরও যখন তিনি ফিরেননি, তখন তাঁর প্রহরীরা মদিনায় ফিরে যায়। মদিনায় তাঁকে তালাশ করেও পাওয়া যায়নি।

কোন কোন প্রহরী বর্ণনা করেন যে, "আমরা এক জায়গায় অবস্থান করে তাঁকে কড়া পাহারা দিচ্ছিলাম। সকাল বেলায় তাঁর উটের গদিতে আমরা কিছুই দেখতে পাইনি। এ দিকে ইমাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ইমাম যুহরী আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান সমীপে উপস্থিত হয়ে হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.)-কে যেভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করেন। অতঃপর আবদুল মালিক বলেন, "যখন আমার কাছে তাঁর নিরুদ্দেশ হবার খবর আসে, তার কিছু পরেই তিনি আমার কাছে চলে আসেন এবং বলেন,

"আমার এবং আপনার মধ্যে শত্রুতা কিসের?" আমি তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বলেন "আমি মোটেই থামব না।" এরপর তিনি বাইরে চলে যান। "আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতাপে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।" এটি মূলতঃ তাসাওউফের প্রতাপ, বেলায়তের অসীম শক্তি।

হযরত খিজির (আ.) এর সঙ্গে কথোপকথন

বেলায়তপ্রাপ্ত অলি-দরবেশদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র বিশেষ নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হযরত খিজির (আ.)'র সম্পর্ক ও যোগাযোগ একটি স্বাভাবিক বিষয়। জনৈক রাবী হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে হযরত খিজির (আ.)'র উপস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনায় উল্লেখ করেন, "একদিন আমি হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা.)'র গৃহে গেলাম। আমার মন চায়নি যে, তাঁকে আওয়াজ দেই। সে ধারণা নিয়ে বাইরে বসে আছি। অবশেষে তিনি বাইরে আসলে আমি তাঁকে সালাম দিয়ে দোয়া নিই। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে একটি প্রাচীরের কাছে আসেন এবং বলেন, "এই প্রাচীরটি দেখেছেন? আমি একদিন এই প্রাচীরে হেলান দিয়ে বিষন্ন মনে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ একজন সুশ্রী ও সজ্জন ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। তাঁর পোশাক অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "হে আলী ইবনে হোসাইন, আপনাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন? যদি দুনিয়ার কারণে বিষন্ন হয়ে থাকেন, তবে দুনিয়া একটি রুটি, যা প্রত্যেক সাধু এবং অসাধু ব্যক্তি খায়।" আমি বললাম, "আমার দুঃখ ও বেদনা দুনিয়ার কারণে নয়। কেননা, দুনিয়ার ব্যাপার তেমনি, যেমন আপনি বর্ণনা করেছেন।" এরপর এই সজ্জন ব্যক্তি বলেন, "যদি আপনার দুঃখ ও বেদনা আখেরাতের কারণে হয়, তবে সেটা এক সত্যিকারের প্রতিশ্রুতি, যাতে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ ফয়সালা করবেন।" আমি বললাম আমার দুঃখ এ কারণেও নয়। আখেরাত তো তেমনি হবে, যেমন আপনি বর্ণনা করলেন। এরপর আগন্তুক বললেন, "হে আলী! তাহলে আপনার বিষন্নতা কী কারণে?" আমি বললাম, "আমি ইবনে যুবায়েরের উপর পতিত ফেত্‌নার কারণে শঙ্কিত আছি।" তখন তিনি বলেন, হে আলী! আপনি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছে আর আল্লাহ্ তাকে দেননি? আমি বললাম– 'না'। এরপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে রাবী জানতে পারেন যে, তিনি ছিলেন হযরত খিজির (আ.)। তিনি হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) সমীপে সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাঁর উত্তোলিত পবিত্র হস্ত কখনো ফেরৎ দেননি

চরম বিপদে বিধ্বস্ত-বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ্ কখনো ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর প্রসারিত হস্তের মুনাজাত কবুল করা ব্যতীত ফেরৎ দেননি। জনগণ যখন যে কোন বিপদ বা দুর্দশায় তাঁর সমীপে দোয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় করতো তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে কখনো দীর্ঘ সিজদারত অবস্থায় আবার কখনো রোনাজারি-কান্নাকাটি করে বিনীতভাবে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ পেশ করতেন। দেখা যেত মুহূর্তেই তাঁর ফরিয়াদ আল্লাহ্ মঞ্জুর করেছেন।

একবার হজের সময় মক্কা নগরীতে ভীষণ খরা দেখা দেয়। একেত সূর্যের তীব্র তাপদাহ অন্যদিকে পানির সংকট সব মিলে মানুষের মধ্যে মাতম দেখা দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজীদের মধ্যে পানির আকাল চলছে। মক্কাবাসীরাও একই ধরনের দুর্বিষহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। পিপাসা এবং গ্রীষ্ম নিবারণের জন্যে পানির তালাশে লোকজনের ছুটোছুটি চলছে। কোথাও পানি মিলছে না। এ ধরনের অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে কাবা শরিফে বিভিন্নভাবে হাজীরা সমবেত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া-ইস্তেস্কা-নফল নামায আদায় করে চলেছেন। কিন্তু বৃষ্টির আলামত নেই, পানির দেখা নেই।

বসরাসহ অনেক দেশ থেকে বেশ কিছু দরবেশও হজে এসেছেন। জনগণ গ্রীষ্মের উত্তাপ এবং পানির সংকট নিরসনের অভিপ্রায় নিয়ে তাঁদেরকেও বিশেষ দোয়া-মুনাজাত করতে বলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

গরমের উষ্ণতা হ্রাস এবং পানির সংকট নিরসনের লক্ষ্যে কাবা শরিফের সর্বত্র ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে হতাশ জনতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অপূর্ব কান্তিময় পরম সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক যুবকের প্রতি। তিনি পরম একাগ্রতায় নিবিষ্ট মনে তাওয়াফ করছেন। অন্য কোন দিকে তাঁর মনোযোগ নেই। কারো হা-হুতাশের প্রতিও তাঁর লক্ষ্য নেই। জনতা লক্ষ্য করলেন তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে অত্যুজ্জল জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটছে। তাওয়াফ শেষে এই যুবক অবসর নিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে অসংখ্য লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরে। কিছু লোক তাঁকে চিনে ফেলেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, ইনিতো আওলাদে রাসুল (দ.)। লোকজন তাঁর পরিচয় পাওয়া মাত্র বলে উঠে, মক্কার সর্বত্র জনগণ পিপাসা কাতর, তাপদাহে অতিষ্ঠ! আপনি অনুগ্রহ করে দোয়া করুন, আল্লাহ্ পাক যেন পানি বর্ষণ করেন।

লোকজনের কাতরতা দেখে অনুরুদ্ধ হয়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) কাবা শরিফের সন্নিকটে এসে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। এরপর সিজদারত হয়ে আল্লাহ্র

দরবারে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাতর আবেদন এবং 'কল্যাণার্থে' পানির জন্যে দোয়া করেন। আওলাদে রাসুল (দ.) হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সিজদারত থাকা অবস্থায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। তীব্র বারি বর্ষণের ফলে কাবা শরিফের আঙ্গিনায় রীতিমতো পানির স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। পিপাসার্ত মক্কাবাসী পানি পেয়ে তৃপ্ত হন। হজে আগত হাজার হাজার জনতা ইমাম সাহেবের পরিচয় জেনে আল্লাহ্র দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন এবং প্রকৃত অর্থে আওলাদে রাসুল (দ.)'র মর্যাদা আল্লাহ্র দরবারে কতো গভীর এবং মমতাময় তা অনুধাবনে সক্ষম হন।

আওলাদে রাসুল (দ.)'র পবিত্র হস্তের পরশে বিপদমুক্তি

প্রতি বছর হজের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে হজ পালনার্থে অসংখ্য পূণ্যার্থীর মহা সম্মেলন ঘটে থাকে। এ ধরনের হজ চলাকালে তাওয়াফ করার সময় এক মহিলা ও পুরুষের হাত হাজরে আসওয়াদের সাথে এমনভাবে লেগে গেল যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা হাজরে আসওয়াদ থেকে মুক্ত করা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তাওয়াফরত জনগণ একপর্যায়ে হাতগুলো কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত দেয়। ইতোমধ্যে আওলাদে রাসুল (দ.) হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) সেখানে পৌঁছেন। তিনি একজন পুরুষ ও একজন নারীর এধরনের বিপদগ্রস্ততা দেখে অগ্রসর হন। তিনি তাঁর পবিত্র হাত তাদের হাতের উপর বুলিয়ে দেন। মহান আল্লাহ্র কী অপরূপ রহস্য, অমনি হাতগুলো হাজরে আসওয়াদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারাও সেখান থেকে সরে পড়ে।

জীব-জন্তু সাক্ষ্য দেয়

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম বান্দাদের এমন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন যার রহস্য সর্বসাধারণের চিন্তা এবং বোধ-বুদ্ধি বহির্ভূত। এ ধরনের বিশেষ অনুগ্রহ নবিদের জন্যে মু'যিজা এবং অলি-দরবেশদের জন্যে কারামত হিসেবে স্বীকৃত ও প্রচারিত। হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা.)'র পবিত্র জীবন প্রবাহ এ ধরনের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। পশু-পাখির ঘটনা সম্পর্কে জনৈক রাবী বর্ণনা করেন, "একদিন আমি আলী ইবনে হোসাইন (রা.)'র নিকটে অবস্থান করছিলাম। তাঁর আশে-পাশে অনেক পাখি যবেহ করা হচ্ছিল। এ ধরনের অবস্থা দেখে তিনি রাবীকে লক্ষ্য করে বলেন, "তুমি জান এ পাখিগুলো কি বলছে?" রাবী বলেন, "তিনি জানেন না। অতঃপর তিনি বলেন, "এরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং বিনিময়ে আজিকার রুযী তলব করে না।"

একবার তিনি নিজের খাদেম, শিশু এবং অন্যান্য লোকদের নিয়ে মরুভূমিতে আসেন। নাশ্তা খাওয়ার জন্যে তিনি মরুভূমির একপাশে দস্তরখান বিছান। তাঁর দস্তরখানের পাশে এক হরিণ এসে অবস্থান নেয়। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন হরিণের দিকে মুখ করে বলেন, "আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব। আমার মা ফাতিমা বিনতে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)। তুমি এসে যাও এবং আমাদের সাথে নাশ্তা করো। হরিণটি এসে তাঁর সঙ্গে নাশ্তা করে একদিকে চলে যায়। তাঁর খাদেমের অনুরোধে তিনি হরিণটিকে আবার ডাকেন। অতঃপর তিনি বলেন, "আমি হরিণটিকে আশ্রয় দেব। তিনি খাদেমকে সতর্ক করে বলেন তুমি তার আশ্রয়ে বাধা দেবে না। খাদেম ইমাম সাহেবের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধা দেবে না বলে কথা দেয়। হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) অতঃপর বলেন, "আমি আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব। আমার জননী ফাতিমা বিনতে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)। একথার পর হরিণটি আবার এসে যায়। হরিণটি ঠিকই দস্তরখানের নিকট থেমে যায় এবং তাঁদের সঙ্গে কিছু খেতে থাকে। ইতোমধ্যে উপস্থিতিদের একজন হরিণের পিঠে হাত রাখতেই হরিণটি ছুটে পালিয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "তুমি আশ্রয় প্রদানকে বাধাগ্রস্ত করেছ। এখন আমি তোমার সাথে কোন কথা বলব না।"

একদিন তাঁর উষ্ট্রী পথিমধ্যে অলসতা করলে তিনি উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন এবং চাবুক দেখিয়ে বলেন, "দ্রুত চলো, নতুবা এই চাবুক দিয়ে তোমাকে শায়েস্তা করবো। এরপর উষ্ট্রী দ্রুত চলতে থাকে এবং চলায় কোন প্রকার অলসতা করেনি।

আরেকবার হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) সঙ্গীগণসহ মরুভূমিতে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ এক হরিণী এসে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। হরিণীটি পা মাটিতে মেরে মেরে সজোরে চিৎকার করতে থাকে। সঙ্গীরা তখন তাঁর নিকট জানতে চায়, "হে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র সন্তান, এই হরিণী কী বলে? জবাবে তিনি সঙ্গীদেরকে অবহিত করে বলেন, "হরিণীটি বলছে যে, অমুক কুরাইশী গতকাল আমার বাচ্চা নিয়ে এসেছে, কাল থেকে আমি বাচ্চাকে দুধ পান করাতে পারিনি।" তাঁর এধরনের ব্যাখ্যায় উপস্থিত লোকদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ইমাম সাহেব তাঁর সঙ্গীদের মনোভাব লক্ষ্য করে সেই কুরাইশীকে ডেকে পাঠান। কুরাইশী এলে তিনি বলেন, এই হরিণী অভিযোগ করছে যে, তুমি তার বাচ্চা নিয়ে এসেছ। সে গতকাল থেকে বাচ্চাটিকে দুধ পান করায়নি। সে এখন আমার কাছে আবেদন করছে যে, আমি তোমাকে তার বাচ্চাটি ফিরিয়ে দিতে বলি, যাতে সে বাচ্চাকে দুধ পান করিয়ে আবার তোমাকে দিয়ে দেবে। ইমাম সাহেবের বক্তব্যে অভিভূত হয়ে লোকটি বাচ্চাটি নিয়ে আসে। হরিণী দুধ পান করার পর ইমাম যয়নুল আবেদীন কুরাইশীকে বলেন, তুমি বাচ্চাটি ছেড়ে দাও। অতঃপর

লোকটি বাচ্চাটি ছেড়ে দেয়। ইমাম সাহেব তখনি বাচ্চাটি মুক্ত করে দিলে হরিণী লাফাতে লাফাতে কিছু অস্পষ্ট শব্দ করে বাচ্চাটি নিয়ে চলে যায়। সঙ্গীরা তাঁকে পুনরায় হরিণী অস্পষ্টভাবে কি বলেছে তা জানতে চায়। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, "হরিণী তোমাদেরকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দেবার জন্যে দোয়া করছে।"

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)-এর একটি উষ্ট্রী ছিল। সেটি মক্কা মোয়ায্যমা যাবার পথে তিনি গদির সামনে চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন। ফলে, সমগ্রপথে তাকে মারার প্রয়োজন হতো না। এমন কি, ফেরার পথেও মারার প্রয়োজন হতো না। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) ওফাতপ্রাপ্ত হলে উষ্ট্রীটি জান্নাতুল বাকীতে তাঁর পবিত্র সমাধির শিয়রে এসে কান্নাকাটি করতে থাকে। এ ধরনের অবস্থা দেখে ইমাম পুত্র হযরত মুহাম্মদ বাকের (রা.) উটকে বলেন, "উঠ, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দেবেন।" উষ্ট্রী ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর সমাধি শিয়র থেকে উঠেনি। এরপর হযরত ইমাম বাকের (রা.) মহামান্য পিতার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, "উটটিকে ছেড়ে দেন। সে চলে যাবে।" এভাবে তিনদিন ইমাম শিয়রে কান্নাকাটি করে উষ্ট্রী মারা যায়।

ষষ্ঠবিংশ

অন্তিম সময়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

কঠোর সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী এবং জনকল্যাণের মধ্যেই মহামহিম সাধক, আওলাদে রাসুল (দ.) হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ভূমিষ্ঠ হবার পরপর মাতৃহারা শিশু স্বাস্থ্যের দিক থেকে ছিলেন দুর্বল। এ ছাড়া কিশোর বয়স থেকে শোক, দুঃখ এবং জ্বালা যন্ত্রণার দহনে-স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবার সুযোগই তাঁর কখনো হয়নি। জালিম শাসকের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি নির্যাতন, উৎপীড়ন, অত্যাচার, কঠোর নজরদারির মধ্যে নিয়মিত রোজা পালন, রিয়াজত ও সাধনায় নিমগ্ন থাকার কারণে তাঁর পক্ষে শরীর এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্ভব ছিল না। সর্বোপরি নিভৃতচারী মহান সাধক হয়েও নিয়মিত জ্ঞান চর্চা, শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা নিবারণ, মিল্লাতের বিভিন্নমুখী ধর্মীয় চাহিদা মিটানো, আরব রাষ্ট্রে ক্ষমতার উত্থান পতনের সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সজাগ-সতর্ক রেখে ধ্যানময় জীবন অক্ষুন্ন রাখার মতো মানসিক প্রস্তুতির লক্ষ্যে তাঁকে কঠিন কঠোর মানসিক চাপের উপর জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। ফলে তাঁর শরীর দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে।

ওফাতের সময়কালে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)

ওফাতের রাতে তিনি স্বীয় পুত্র এবং বেলায়তের আমানতকারী পরবর্তী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) (প্রসিদ্ধ হচ্ছে ইমাম বাকের রা.)-কে বলেন, “প্রিয় বৎস, আমার জন্যে ওজুর পানি আন।” পানি আনা হলে তিনি আরো পানি চাইলেন। কেননা এই পানিতে নাপাক বস্তু ছিল। আঁধার রাতে তা দেখা যায়নি। হযরত বাকের (রা.) বাতি এনে খুব সাবধানতা সহকারে দেখলেন এই পানিতে মৃত ইঁদুর রয়েছে। ফলে আবার পানি আনা হলে তিনি ওজু করেন। এরপর পুত্রকে বলেন, “প্রিয় বৎস! আজ রাত আমার বিদায় ক্ষণ।” এরপর তিনি নামায এবং ইবাদতে মশগুল হন। এ ধরনের ধ্যানমগ্ন এবং ইবাদতে মশগুল অবস্থায় জগৎ মশহুর এই মহান সাধক, আওলাদে রাসুল (দ.) ওফাতপ্রাপ্ত হন।

ওফাতের সময়কাল হচ্ছে ৯৪ হিজরীর ১৮ মুহর্‌রম। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বৎসর। তিনি মদিনা শরিফে ওফাতপ্রাপ্ত হন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে নবি (দ.) দুলারী মা ফাতিমা যোহরা (রা.) এর কদম শরিফের নিচে, চাচা হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.)'র পাশে দাফন করা হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) অর্থাৎ হযরত ইমাম বাকের (রা.) তাঁর পবিত্র দেহ কবরে শুইয়ে দেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

বেলায়তের উত্তরাধিকার এবং ইমামত

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র জীবন প্রদীপ যখন নিভে যাবার সময় ঘনীভুত হয় তিনি তখন লিখিতভাবে প্রকাশ্যে তাঁর যোগ্যতম সন্তান হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) অর্থাৎ ইমাম বাকের (রা.) কে তাঁর নিকট গচ্ছিত থাকা বেলায়তের ওয়ারেছ মনোনীত করে যান। তাসাওউফের শিক্ষাকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী রাখার জন্যে তিনি অছিয়ত হিসেবে বিভিন্ন নির্দেশ তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করান। এ নির্দেশনামার মধ্যে অন্যতম ছিল তাসাওউফ ধারা যেন সাধকদের উত্তরাধিকার নিযুক্তির মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। পারিবারিক পরিবেশ হতে মারেফাতের যে সকল সুক্ষ্মতত্ত্ব তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তা তিনি উপযুক্ততার ক্রমধারা নির্ধারণ করে ছড়িয়ে দেন। অনুসারীদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধকৃত তাসাওউফ শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনামা পরবর্তী সময়ে "সহিফা-ই-সাজ্জাদিয়া" নামে সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়। 'সহিফা-ই-সাজ্জাদিয়া'র প্রথম দোয়ায় আল্লাহ্‌র অনবদ্য ও অনুপম প্রশংসা করতে গিয়ে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) উল্লেখ করেন, "আপনি সেই আল্লাহ্ দর্শকের দৃষ্টি যাকে দেখতে পায় না। বর্ণনাকারীদের চিন্তা বা কল্পনাশক্তি আপনার বর্ণনা দিতে অক্ষম। আপনি নিজ ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকুল ও তাদের সৃষ্টি করেছেন নিজ ইচ্ছায়। অথচ এর আগে এসব সৃষ্টির কোনো মডেল বা নমুনার অস্তিত্ব ছিল না। সহিফা-ই-সাজ্জাদিয়ায় তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতির দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করেছেন। 'রিসালাতুল হুকুক' তাঁর নির্দেশাবলী সম্পর্কিত আরেকটি মূল্যবান সংকলন। এটি মূলতঃ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত বর্ণনা। এতে মানুষের স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, সহচর, প্রতিবেশী, বন্ধু, অংশীদার, অর্থ, ঋণপ্রার্থী, শত্রু, খারাপ লোক, ভিক্ষুক, দ্বীনী ভাই, কাফির, ভিন্নধর্মাবলম্বী, ভিন্নমতাদর্শী সকলের একসাথে বসবাস করার অধিকার সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাঁর প্রদত্ত অছিয়তের আলোকধারায় পরবর্তী সময়ে তাঁর পৌত্র সাধককূলের হাদী সৈয়্যদানা হযরত জাফর সাদেক (রা.) তাসাওউফ শিক্ষাক্রম তথা প্রশিক্ষণধারা চালু করেন। এর ফলে গড়ে উঠা অসংখ্য অলি-দরবেশের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় তাসাওউফ তথা সুফিবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) (হযরত বাকের রা.) এর প্রতি উপদেশ

ওফাতের পূর্বে হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) স্বীয় সুযোগ্য পুত্র ইমাম বাকের (রা.)-কে সংসার জীবন যাপন সংক্রান্ত কিছু উপদেশ প্রদান করেন। এ গুলো মূলতঃ পার্থিব জীবন ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপদেশ বাণী। পার্থিব সমাজে বিচিত্র খাসলতের বহুরূপী মানুষের বিচরণ লক্ষ্য করে ইমাম সাহেব তাঁর পুত্রকে জনগণের সঙ্গে মেলা মেশা এবং কাজ কারবারে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

পাঁচ ধরনের লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা করতে তিনি তাঁর পুত্রকে নিষেধ করেন। এদের পরিচিত দিয়ে তিনি বলেন,

১. ফাসেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। ওদের সাহচর্য থেকে সর্বাবস্থায় দূরে সরে থাকবে। এ সমস্ত লোক তোমাকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করবে। যে সব কাজের কোন প্রয়োজন নেই, এ ধরনের কর্মে আত্মনিয়োজিত হতে ফাসেকরা প্ররোচিত করবে।

২. কখনো কৃপণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। কারণ কোন সময় তুমি আর্থিক অনটনে পতিত হলে সে নিঃসংকোচে তোমাকে পরিত্যাগ করবে।

৩. মিথ্যাবাদীর সাথে বন্ধুত্ব করবে না। মিথ্যাবাদী সর্বত্রই মিথ্যা ছড়ায়। এরা পরিপূর্ণভাবে অবিশ্বস্ত। এরা স্বভাবজাত কারণে তোমার আপনজন থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেবে।

৪. কখনো বোকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। এরা এতো বেশি অজ্ঞ এবং বেখেয়াল থাকে যে, তোমার উপকার করতে গিয়ে ভয়ানক ক্ষতি করে ফেলবে। যার প্রতিকার কখনো সম্ভব হবে না।

৫. রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কারণ-আমি যে সমস্ত আসমানী কিতাব পাঠ করেছি, প্রত্যেকটিতেই এ ধরনের লোককে অভিশপ্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.)'র সন্তান-সন্ততি

তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য আছে। কারো কারো মতে তাঁর পুত্র সন্তান আটজন, যাঁরা সকলে হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত তাপস ব্যক্তিত্ব হযরত ইমাম বাকের (রা.) এই মহিয়সী রমণীর গর্ভজাত সন্তান। অন্য অনেকের মতে তিনি দশজন পুত্র সন্তান এবং চৌত্রিশজন কন্যা সন্তান রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমে আহলে বাইতের হোসাইনী বংশধারার বিকাশ ঘটে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন দান-খয়রাত এবং পরোপকারে ছিলেন দরাজ দিলের মহান ব্যক্তিত্ব। কোন সময় কোন ভিক্ষুক কিছু চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কিছু দান করেই বিদায় দিতেন। তিনি বলতেন, "সাদাকাহ্ ভিক্ষুকের হস্তগত হবার পূর্বে আল্লাহ্ পাকের হস্তগত হয়।" এক ব্যক্তি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, "দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তি কে? তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সচ্ছল ও সুখী থাকা সত্ত্বেও অন্যায় পথ অবলম্বন করে না।" তিনি সবসময় বলতেন, "কখনো অহংকার করো না, অহংকার হারাম।" কতিপয় ব্যক্তি তাঁকে নবিজী (দ.)'র সঙ্গে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) এবং উমর ফারুকের (রা.) সম্পর্ক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এখানে যেমন ছিলেন তেমনি।'

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার সঙ্গে ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এর সম্পর্ক

ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, এই ত্বরিকার সূত্র হচ্ছেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)। তাঁর নিকট থেকে অছি হিসেবে বেলায়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হযরত আলী (রা.)। হযরত আলী (রা.) থেকে বেলায়তের আমানত প্রাপ্ত সৈয়্যদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), তাঁর নিকট থেকে বালক বয়সে বেলায়তের আমানত প্রাপ্ত সৈয়্যদুশ সালেকীন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রা.) এবং তৎপরবর্তী ক্রমঃ শেষে হযরত ইমাম আলী ইবনে মূসা রেজা (রা.) পর্যন্ত সর্বমোট আটজন আহলে বাইত এবং আহলে বাইতের পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবে আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ মর্যাদাভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। এ কারণে প্রত্যেকবার মুনাজাত চলাকালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাঁদের নাম পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আমিন!

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. আল-কোরআন

২. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি– ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, গ্লোব লাইব্রেরী লিঃ।

৩. ইমাম যয়নুল আবেদীন– মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদিনা পাবলিকেশনস, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

৪. শাওয়াহেদুন নবুওত– মূলঃ আল্লামা আবদুর রহমান জামী (রহ.) অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদিনা পাবলিকেশনস।

৫. বিশ্বনবির পরিবার বা আহলে বাইত– নাসির হেলাল, খন্দকার প্রকাশনী, বাংলা বাজার বুক এন্ড কম্পিউটারস কমপ্লেক্স।

৬. কাশফুল মাহজুব বা মারেফাতের সারকথা– মূলঃ হযরত দাতা গন্জে বখ্‌শ (রহ.), অনুবাদঃ মুহম্মদ সিরাজুল হক, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা-চট্টগ্রাম।

৭. সৈয়্যদ ফাতেমা বতুল রাসুল (দ.)–আল্লামা মুফতী কাজী মুহাম্মদ ওয়াজেদ, গাউসিয়া প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

৮. কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত– মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ্, হাওলাদার প্রকাশনী, মন্নান মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা–১১০০।

৯. তারিখে মিল্লাত (৩য় খণ্ড) মূলঃ কাজী যয়নুল আবেদীন মিরাতী, অনুবাদ, মাওলানা নোমান আহমদ মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা–১১০০।

১০. শেখ সাদী'র ১৫২ গল্পঃ মাওলানা আবদুর রহমান খন্দকার, সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১১. দিওয়ান-ই মুঈনুদ্দিনঃ মূলঃ হযরত খাজা মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান, খাজা মনজিল, ৫৯২, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা–১২১৭।

১২. আল ফারুক–মূলঃ আল্লামা শিবলী নোমানী, অনুবাদকঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, এমদাদিয়া, লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

১৩. ইন্টারনেট।

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN: 978-984-8083-39-0